সূচিপত্র

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৮ম বর্ষ
১২তম সংখ্যা
মার্চ-২০২৬

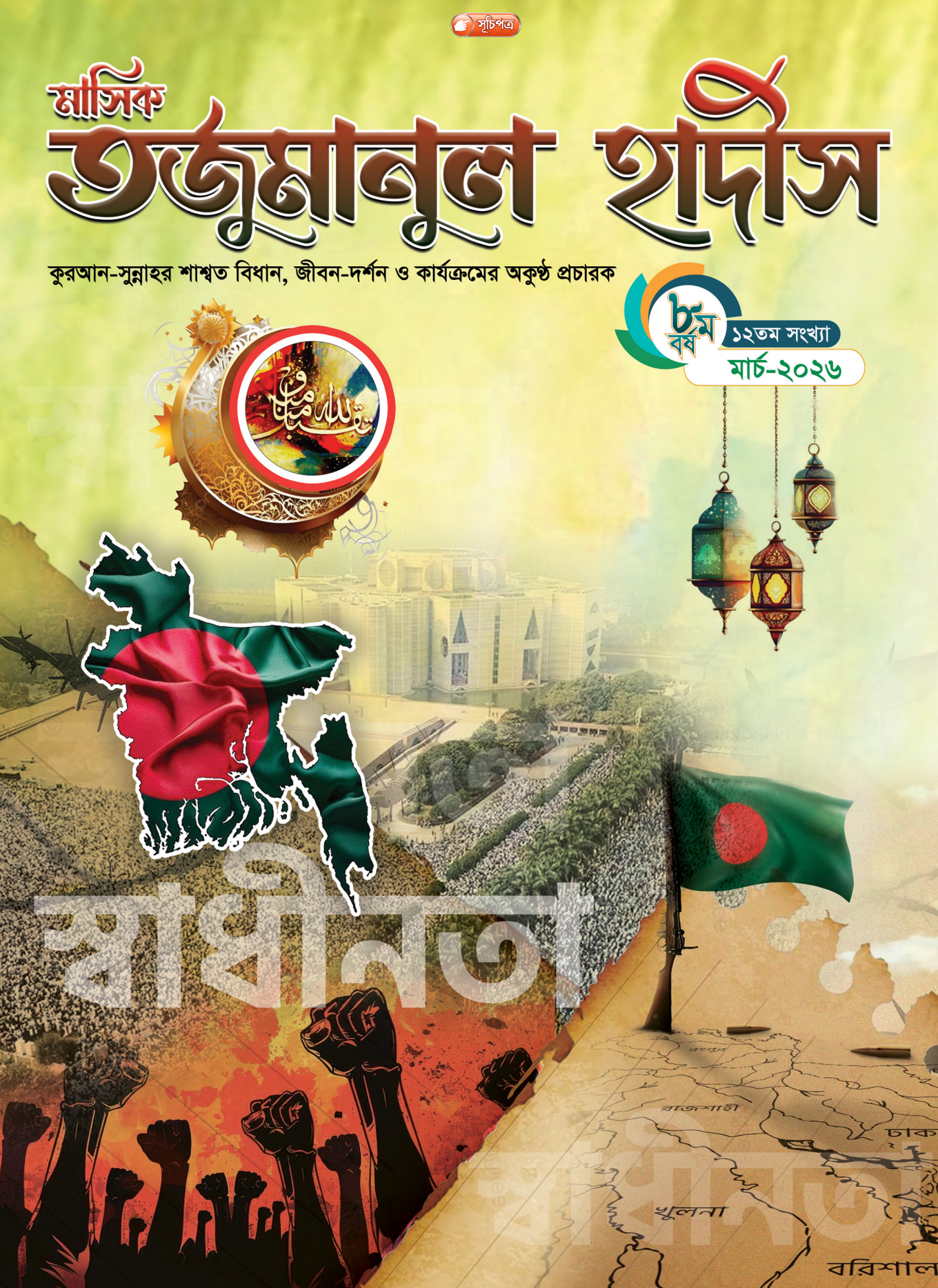

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	”	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	”	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	”	৩২/-
৫	তারাবীহ	”	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	”	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	”	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	”	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	”	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	”	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	”	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	”	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	”	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

“বিকাশ নম্বর”
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

“সাপ্তাহিক আরাফাত”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

৮ম বর্ষ, ১২তম

মার্চ ২০২৬ ঈসায়ী

রামাযান-শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম

প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন

শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী

প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান

মো: জামাল হোসেন

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১

ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬

মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ

বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠

الهاتف : ٢٢٤٤٥٨٥٥١-٨٨٠٢+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،

المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،

رئيس التحرير: أ/محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসার কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
❖ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় করণীয়।......... ৩

দারসুল কুরআন
❖ লাইলাতুল কদরের ফযীলত ও মাসআলা-মাসায়েল।........... ৪
শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী

দারসুল হাদীস
❖ শাওয়ালের ছয় রোযার গুরুত্ব।..৬
ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী

প্রবন্ধ :
❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র......৭
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী

❖ সালাফ চরিত।..৯
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

❖ নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন? ।..............................১৩
ড. রেজাউল করিম মাদানী

❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।..................১৭
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

❖ সত্য চির আম্লান।...২০
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

❖ ফেরেশতাদের দু'আপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মানুষ।.................২৪
আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ

❖ নারীদের সিয়াম।...২৭
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
❖ যেমন ছিল সালাফদের রামাযান।....................................৩১
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।...৩৬

সম্পাদকীয় الافتتاحية

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় করণীয়

ঈদুল ফিত্‌র আসন্ন। এ ঈদ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মহা-আনন্দ ও অনাবিল সুখের বার্তা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম, ক্বিয়াম, সাদাক্বা ও কল্যাণকর কাজ করার পর পুরস্কার পাওয়ার পালা। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ খোলা ময়দানে ঈদের সালাতে সমবেত হয়। মহান আল্লাহর তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয় পুরো মাঠ। সকলে কায়মনোবাক্যে নির্ভেজাল তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করে। সবার চোখে-মুখে একই চাহনি- আজই তারা এক মাসের স্বাধনার ফল ঘরে তুলবে। দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা। ঈদের সালাত আদায় করে পুলকিত মনে সবাই ঘরে ফিরবে এবং অত্মীয়-স্বজনের সাথে কুশল বিনিময় করবে। পাড়া-প্রতিবেশী অসহায়-অনাথ ও সাধারণের সাথে শান্তির বারতা নিয়ে মিলিত হবে। এ দৃশ্য কতই না মধুর।

(দুই)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের ভিত্তি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয়; এটি ছিল আত্মমর্যাদা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ন্যায়বিচারের সংগ্রাম। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি রক্তস্নাত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার পেছনে রয়েছে লাখো আত্মত্যাগ এবং অগণিত মানুষের অবদান। এ গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা আমাদের, নাগরিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

স্বাধীনতার ইতিহাস রক্ষার প্রথম শর্ত হলো যে লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তার যথার্থ বাস্তবায়নে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং সঠিক ইতিহাস চর্চা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্ভুল ও গবেষণালব্ধ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তরুণ প্রজন্ম যেন বিভ্রান্তিকর তথ্যের শিকার না হয়, সে জন্য দলিলভিত্তিক ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আর্কাইভ ও গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিকায়ন করে মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক স্থাপনা যেমন- লালবাগ কেল্লা এবং আহসান মঞ্জিল-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো আমাদের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। এসব স্থানে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা কার্যক্রম ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করলে নতুন প্রজন্ম ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

তৃতীয়ত, অপসংস্কৃতি মুক্ত সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য ও প্রামাণ্য উপস্থাপন নিশ্চিত করা জরুরি। বিকৃত ইতিহাস বা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

চতুর্থত, রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সরকারকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক দলিল নষ্ট বা বিকৃত করার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। পাশাপাশি পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ–দেশপ্রেম, মানবতা ও ন্যায়বিচার–চর্চা করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার ইতিহাস কেবল অতীত স্মরণ নয়; এটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণা। যদি আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে আন্তরিক হই, তবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্বাধীনতার চেতনা অম্লান থাকবে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে এই মহান দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই।❑❑

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

লাইলাতুল কদরের ফযীলত ও মাসআলা-মাসায়েল

শাইখ ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী ❖

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সর্বপ্রথম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে মাসিক "তর্জুমানুল হাদীস"-এ দারসুল কুরআন পেশ করার তাওফীক দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর ওপর।

অতঃপর, আজকের দারসের জন্য আমি নির্বাচন করেছি পবিত্র সূরা আল-কদর। ইন শা-আল্লাহ এ সূরার অর্থ, সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ফযীলত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করে দারস সমাপ্ত করব।

আমরা জানি, সমগ্র কুরআনুল কারীমই ফযীলতপূর্ণ। সূরা আল-কদর কুরআনের ৯৭তম সূরা। তবে এ সূরা নির্দিষ্ট সংখ্যক বার পাঠ করলে বিশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে- এমন কোনো সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত নেই। বরং এর ফযীলত নিহিত রয়েছে এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই। এতে লাইলাতুল কদরের মহিমা ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এবং সে বরকতময় রাতকে ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সূরাটিতে মোট পাঁচটি আয়াত রয়েছে।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) ﴾

১. নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে।

২. আর আপনাকে কী জানাবো, লাইলাতুল কদর কী?

৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

৪. সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন।

৫. সে রাত শান্তিময়-ফজরের উদয় পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ অর্থাৎ, আমরা কুরআন নাযিল করেছি মর্যাদায় পরিপূর্ণ এক রাতে-যা রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ হে নবী! আপনি কীভাবে জানবেন, লাইলাতুল কদরের প্রকৃত মর্যাদা কত মহান?

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ এ রাত বরকতময়; এ রাতে করা সৎকর্ম এমন হাজার মাসের সৎকর্ম থেকেও উত্তম, যার মধ্যে লাইলাতুল কদর নেই। এটি এ উম্মাতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ।

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾

এ রাতে অসংখ্য ফেরেশতা এবং রূহ-অর্থাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম-তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন, সে বছরের নির্ধারিত সকল বিষয় নিয়ে।

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ এ রাত সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ; ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এতে কোনো অকল্যাণ নেই।[১]

❖ লাইলাতুল কদরের ফযীলত :

১. এ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ নিশ্চয়ই আমরা এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল ক্বাদরে।'

২. হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

৩. ফেরেশতাগণের অবতরণ।

❖ ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্মমন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

[১] আত-তাফসীরুল মুইয়াসসার

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ এ রাতে অসংখ্য ফেরেশতা ও জিবরীল ﷺ অবতীর্ণ হন।

❖ **কিছু মাসআলা :** লাইলাতুল কদর এক মহান মর্যাদার রজনী। এ রাতকে ইবাদত, সালাত, যিকির, দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত ও নেক আমলের মাধ্যমে জাগ্রত থাকা সুন্নত। এ রাতেই মহান আল্লাহ তা'আলা বছরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ফয়সালা নির্ধারণ করেন।

❖ **গুনাহ মাফের সুসংবাদ :**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম করবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২]

❖ **লাইলাতুল কদরে করণীয় :**

১. কিয়ামুল লাইল :

এ রাতে অধিক পরিমাণে নফল সালাত আদায় করা সুন্নাত।

২. ই'তিকাফ :

রাসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানের জন্য।

৩. দু'আ :

আয়িশা رضي الله عنها জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাকে এ দু'আ শিক্ষা দেন :

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"[৩]

৪. সকল নেক আমল :

তিলাওয়াত, যিকির, সাদাকা, ইলম চর্চা-সহ নেক কাজই এ রাতে বহুগুণে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।

লাইলাতুল কদরের সময় : রমযানের শেষ দশকে বিশেষত বেজোড় রাতগুলোতে। রাসূল ﷺ বলেন : "রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"[৪]

এটি কি প্রতি বছর একই রাতে?

না। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি প্রতি বছর পরিবর্তিত হয় এবং শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এ মতকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহসহ অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেছেন।

লাইলাতুল কদরের নিদর্শন : সহীহ মুসলিমে এসেছে, এর পরদিন সূর্য উদিত হবে-

সাদা ও স্বচ্ছ তীব্র রশ্মিহীন। আরো বর্ণিত হয়েছে, রাতটি হবে শান্ত ও সহনীয়; না অতিরিক্ত গরম, না অতিরিক্ত ঠাণ্ডা।

লাইলাতুল কদরে উমরাহর হুকুম : উমরাহ যেকোনো সময় সুন্নাত। রমাযানে উমরাহ আদায় করা বিশেষ ফযীলতপূর্ণ; কারণ তা হজ্জের সমান সওয়াবের কারণ হয়।[৫]

তবে লাইলাতুল কদরের রাতকে বিশেষভাবে উমরাহর জন্য নির্ধারণ করা বিদ'আত। কেননা শরীয়ত এ রাতকে কিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, উমরাহর জন্য নয়।

আকীদা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

লাইলাতুল কদর কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

এ রাত উঠিয়ে নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইমাম নববী رحمه الله ইজমা উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

হে প্রিয় পাঠক!

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে লাইলাতুল কদর এমন এক মহাসুযোগ, যা একজন মু'মিনের জীবন আমূল পরিবর্তন করতে পারে। তাই সালাফে সালেহীনের অনুসরণে রমাযানের শেষ দশকে অধিক ইবাদত, আন্তরিক দু'আ ও পূর্ণ ইখলাসের সাথে আমল করা আমাদের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে লাইলাতুল কদর লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।❑❑

[২] সহীহ বুখারী হা : ১৯০১ ও সহীহ মুসলিম।
[৩] সুনান তিরমিযী ও সুনান ইবনু মাজাহ।
[৪] সহীহ বুখারী।
[৫] সহীহ হাদীস।

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

শাওয়ালের ছয় রোযার গুরুত্ব

ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَقُوْلُ وَاللهِ لأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّيْ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমার ব্যাপারে এরূপ কথা পৌঁছে যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন সওম পালন করব এবং রাতভর সলাত আদায় করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন : তুমি তো এরূপ করতে সক্ষম হবে না। বরং তুমি সাওম পালন করো ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সালাত আদায় করো ও নিদ্রাও যাও। তুমি মাসে তিন দিন সাওম পালন করো, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর হতে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একদিন সাওম পালন করো এবং দু’দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর হতে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একদিন সওম পালন করো আর একদিন ছেড়ে দাও। এ হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সওম এবং এ হলো সর্বোত্তম (সওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: এর চেয়ে উত্তম সওম আর নেই।[৬]

রাবী তথা বর্ণনাকারীর জীবন চরিত : ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশ বংশের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ও জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। আবার কেউ বলেন, আবূ ‘আবদুর রহমান। প্রথম যুগের সাহাবীদের একজন ও অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের ফক্বীহ ও ‘ইবাদাতগুযার সাহাবী ছিলেন। তিনি ৬৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন,[৭] তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০।

ব্যাখ্যা : ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বছরব্যাপী সাওম পালন ও সারারাত্রি কিয়ামুল লাইল পালনের শপথ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম কী পরিমাণ আল্লাহর ‘ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। কিন্তু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তা অনুমোদিত না হওয়া থেকে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শুধুমাত্র আখেরাতমুখী ধর্ম নয় বরং ইসলাম দীন ও দুনিয়ার নাম। ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম। আর সে কারণেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপর এক হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। যারা অধিক হারে সাওম পালন করতে আগ্রহী তাদের জন্য নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ সাওম পালনের অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, যেহেতু নেক কাজের ফল তার দশগুণ; তাই এভাবেই সারা বছরের সওম পালন হয়ে যাবে। অর্থাৎ- প্রতি মাসে ৩ দিন রোযা রাখলেই দশগুণ হিসেবে পূর্ণ মাসের সাওয়াব অর্জিত হয়, আর ১২ মাসে ৩ দিন করে সাওম পালন করলে পূর্ণ বছরের সাওম পালনের সাওয়াব অর্জিত হয়। এই ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা পালনকে আইয়ামে বীযের সাওম বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পূর্ণ এক মাস রামযানের সিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসে যদি কেউ ৬টি সাওম পালন করে সেও অনুরূপ পূর্ণ এক বছরের সাওম পালনের সাওয়াব অর্জন করবে। আর মূলতঃ তা এভাবে যে, রামাযানের ৩০ রোযায় ৩০×১০ = ৩০০ দিনের সাওয়াব অর্জন হবে। আর শাওয়ালের ছয় রোযায় ৬×১০ = ৬০ দিনের সাওয়াব অর্জন হবে। অর্থাৎ- ৩৬০ দিনের সাওয়াব অর্জন হয়ে যাবে রামাযানের এক মাস ও শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার মাধ্যমে। ৩৬০ দিন চন্দ্র বর্ষের হিসাবে পূর্ণ এক বছর। আর এতে তার জন্য রয়েছে বৃহৎ সওয়াব। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّ مَا صَامَ الدَّهْرَ

“যে ব্যক্তি রমাযানের সাওম রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি সাওম পালন করে সে ব্যক্তির পূর্ণ বছরের সাওম রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।”[৮] ঈদের পরেই ধারাবাহিকভাবে ৬টি সাওম পালন করা উত্তম তবে মাসের যে কোন দিন বিরতি দিয়েও শাওয়ালের সাওম পালন করা যায়।[৯] □□

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[৬] *সহীহ বুখারী হা. ১১৩১ ও ১৯৭৬।*

[৭] *মুযাক্কিরাতুল হাদীস আন নাবাবী- আলামা ড. রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী, ৬৮ পৃ.।*

[৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৪; আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্।*

[৯] *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- ফাতাওয়া নং- ৪৪১।*

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ইতোমধ্যে জীবন থেকে কমবেশি সত্তরটি বছর কেটে গেছে। বদর প্রান্তরের কথা বহুবার বহুভাবে পড়েছি; কিন্তু সেখানে বালুর পাহাড় আছে তা কিন্তু অন্তত আমার নজরে আসেনি। অবাক দৃষ্টিতে দেখলাম বামে, সামনে-পেছনে পাহাড়। সামান্য ব্যবধানে আবার বালুকার পাহাড়। মনে উদয় হলো স্রষ্টার কী বিচিত্র সৃষ্টি! কঠিন প্রস্তর নির্মিত পাহাড় আবার পাশেই বালুর পাহাড়! মানুষের মাঝে এরূপ বৈচিত্র্যের উপস্থাপনা ঈমানী চেতনাকে যেমন মজবুত করে তেমনি হাজারো প্রশ্ন উদিত হয়। বিশ্বাসের চোরাবালি হাতড়াতে গিয়ে যেন বিশ্বাস হারা না হই।

ঈমানচর্চা দ্বারা পূর্ণতা বিধানের প্রামাণিক কত কথাই না আছে! স্বয়ং নবী-রাসূলগণও ধাঁধায় পড়েছেন। বিনীতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে জানিয়েছেন ঈমানের পূর্ণতা-বিধানের জন্য প্রমাণ প্রয়োজন। রব্বে কারীম দয়াপরবশ হয়ে মানবকুলকে তা জানিয়েছেন। কুরআন[১] সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, একদিন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন "হে আমার প্রতিপালক? আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ জিজ্ঞেসা করলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি; কিন্তু অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্য (দেখতে চাই) তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন :

১. চারটি পাখি নাও;

২. সেগুলোকে নিজের সাথে অভ্যস্ত করো;

৩. তারপর সেগুলোকে জবেহ করে টুকরো টুকরো করো;

৪. টুকরোগুলোকে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর রেখে দাও এরপর-

৫. সেগুলোকে ডাক দাও।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করলেন। তারপর যখন তিনি পাখিগুলোকে ডাক দিলেন, তখন আল্লাহর কুদরতে পাখিগুলোর বিছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত হয়ে আবার জীবিত অবস্থায় তার কাছে উড়ে এলো। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! একজন বিশিষ্ট নবী, যিনি নানা পরীক্ষা ও প্রশ্নের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। তবে তার মতো নবীর মনে যদি সৃষ্ট দ্বিধা অপসারণের প্রয়োজন পড়ে, তবে আমাদের কী অবস্থা! এজন্য বারে বারে দ্বারে দ্বারে ঈমানের দাওয়াত দিলেই ওই বিশ্বাসের পরশে আমরা সিক্ত হতে পারবো। বস্তুত দৃঢ় ঈমানের পাশাপাশি অন্তরের প্রশান্তির প্রয়োজন। আর তা অর্জিত হতে পারে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে। অধিকাংশ নবীকেই জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও পরীক্ষার মাধ্যমে পূর্ণতা পেতে হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাওয়া তা'আলা মানবজীবনে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আর এজন্য রয়েছে তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব। তিনি মাধ্যমকে (নিজাম) অনুসরণীয় উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বদরের সফর আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

বদরের যুদ্ধ ছিল একটি অসম প্রতিযোগিতা। সেখানে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হবে এটি নির্ধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশেষ মাধ্যমে তা মুসলিমদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তা কী ভাবে?

প্রথমত : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত ঘুমাননি; হাত পেতে যাচঞা করেছেন নিজের জন্য। যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য। ইসলামের বিজয়ের জন্য।

দ্বিতীয়ত : আকলকে ব্যবহার করে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পজিশন নিয়েছেন ঠিকমতো। সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু পরিকল্পনা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। মুসলিম বাহিনী আগে কৌশল ঠিক করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে রওনা হয়। বদর ছিল কুপসমৃদ্ধ এলাকা। যুদ্ধে পানির উৎস নিয়ন্ত্রণ ছিল কৌশলগতভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা

❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৬০।

বদরের গুরুত্বপুর্ণ কুপগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ফলে শত্রুপক্ষ পানির সংকটে পড়ে। তারপর আসে ঐশী সাহায্য। বারিপাত হলো। যুদ্ধের ময়দান হলো শক্ত।[২]

কুরআনুল কারীমে এই ধরনের কতিপয় বিষয়ের ইঙ্গিত মেলে।[৩] নবী ﷺ দু'আ করলে আল্লাহ বললেন : আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে। আরো বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ ও ও অন্তরের প্রশান্তির জন্য। যে প্রশান্তি খুঁজে নবী-রাসূলগণ ঈমানী পূর্ণতা অর্জন করেছেন।

আল্লাহর ভাণ্ডার তো সীমাহীন! সূরা আল ইমরানে উল্লেখ আছে- তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিনহাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তিনি পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

তাফসীরকারকদের বর্ণনা অনুযায়ী অবগত হওয়া যায় যে, ফেরেশতারা মানুষের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের কেউ কেউ সাদা পাগড়ি বা বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট ছিলেন। ফেরেশতাদের আগমনের ফলে মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি করেন এবং শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়। ফেরেশতা সকল সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সীরাত ও হাদীস গ্রন্থ সূত্রে এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।

বদর ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। যুদ্ধে অর্জিত বিজয় ইসলামি চেতনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। অবিশ্বাসীদের অহংকারের ভূমিধ্বস পতন ইসলাম ও নবীকে মহিমান্বিত করে তোলে।

এ যুদ্ধে অধিকাংশ আনসার অংশগ্রহণ করেন। মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৮২/৮৬ জন। ৭০টি উট ও মাত্র ২টি ঘোড়াই ছিল মুসলিমদের বাহন। হ্যাঁ, মুসলিমদের আরো একটি বড় সম্বল ছিল ঈমানী জযবা। মদীনা থেকে অন্তত দেড়শ কিমি. দক্ষিণের এ বদর প্রান্তরে কুরাইশরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ১০০০ সৈন্য নিয়ে। মুসলিমরা অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করে ৭০ জনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। কুরাইশ নেতা আবু জাহল নিহত হন, এমনি একটি ইতিহাস সম্বলিত জায়গা পরিদর্শন করতে পেরে ধন্য মনে করছি।

বদর প্রান্তর পৌঁছার আগে আরো একটি পানির কুপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে অজস্র মানুষের উপস্থিতি আমাকে হতবাক করে তোলে। লোক পরম্পরায় জানা যায়, কুপটির পানি ব্যবহার করলে রোগ-ব্যধি থেকে মুক্তি মেলে। পানিনির্ভর মুক্তি মানুষের আক্বীদাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলে। বস্তুত পানির কোনোই ক্ষমতা নেই- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি না চান। অবশ্য জমজম কুপের পানিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে শক্তি দিয়ে রেখেছেন। সহীহ মুসলিম সূত্রে (হাদীস ২৪৭৩) জানা যায় যে, জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সে উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং তা খাদ্যের বিকল্পও বটে। জলীলুল কদর সাহাবি আবু যর গিফারী رضي الله عنه প্রায় ৩০ দিন শুধু জমজমের পানি পান করেছিলেন।

আল্লাহর যমীন পরিভ্রমণ করে সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে অবলোকন করতে বলা হয়েছে। সে সূত্রে হজ্ব পালনই হলো এমন এক সফর, যেখানে ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়। আমরা জানি, বদর বর্তমান সৌদি আরব-এর পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রাচীনকালে বদর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার উল্লিখিত কুপসমূহ ছিল কাফেলাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পানির উৎস। এখানে ইসলামের প্রথম বড় সামরিক বিজয়ই অর্জিত হয়নি; এ জায়গা আমরা খুঁজে পেয়েছি ঈমান ও আত্মত্যাগের অপরূপ দৃষ্টান্ত ও কুরআনিক স্বীকৃতি। এখানে যুদ্ধসংঘটিত হওয়ার ফলে বদরবাসীর মর্যাদা বেড়ে যায়। যেসব সাহাবি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা 'আহলে বদর' নামে পরিচিত এবং ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত।

কয়েক ঘণ্টা বদরে অতিবাহিত করি। ফেরেশতাকুলের আগমন ও বিজয় অর্জন আমাদের আপ্লুত করে। বিশেষত যেখানে ফেরেশতাদের পদচারণা ঘটেছে, জান্নাতী সাহাবীদের পদচারণায় ও ক্ষিপ্রতায় বিজয়মালা ছিনিয়ে এনেছে। তা কতই না স্মৃতিবহ ও মোবারক প্রপঞ্চ বদর এলাকা ইসলামের ইতিহাসে ঈমান, ত্যাগ ও আল্লাহর সাহায্যের এক অনন্য স্মারক। বদর পরিভ্রমণ করে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, সংখ্যায় কম হলেও সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকলে বিজয় সম্ভব। -চলবে ইন শা-আল্লাহ

[২] সূরা আল-আনফাল আয়াত : ৯-১২।
[৩] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১২৪।

সালাফ চরিত

উওয়াইস আল-কারনী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

উওয়াইস বিন আমের আল-কারনী ইয়ামানের কারন্ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কাতারে যোগ দিতে পারেননি। তিনি উমর ইবনে আল খাত্তাব এবং তাঁর পরবর্তীদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তিনি তাঁর দুনিয়া বিমুখতা এবং নির্জনতার জন্য আসক্ত ছিলেন।

ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : তিনি তাঁর সময়ের লোকদের আদর্শ, তাবেয়ীদের নেতা। তিনি ছিলেন আল্লাহর ধার্মিক ওলী এবং তাঁর মুখলিস বান্দাদের একজন।"

অত্র প্রবন্ধে আমরা তার জীবনীর কিছু দিক আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। এর মধ্যে সত্যিকার মুমিনদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

উমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه ২৩ হিজরীতে হজ্জ পালন করতে গেলেন। এটা ছিল তাঁর শাহাদাতের কিছু দিন আগে। হজ্জের সময় তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাত্র একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া। যিনি ছিলেন তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম। যার সাথে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন। উমার নিজেই আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে হাজীদের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে ইয়ামানের হাজীগণ! মুরাদ গোত্রের কারন্ শাখার হাজীগণের মধ্যে উওয়াইস বিন আমের নামে কোনো লোক কি তোমাদের মধ্যে আছে? তখন কারন্ গোত্রের একজন লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি উওয়াইস সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছেন। আমাদের মধ্যে উওয়াইস নামে এমন কেউ নেই, যে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে। তবে আমার ভাগ্নের নাম উয়াইস বিন আমের। আর সে কারন্ গোত্রের লোক। কিন্তু সে তো আপনার কাছে তেমন কোনো গরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়। সে একজন সাধারণ মানুষ, উটের রাখাল। তাকে উওয়াইস বলে ডাকা হয়। আমি তার মামা। সে আমাদের মধ্যে একজন নগন্য-তুচ্ছ, অপরিচিত, দরিদ্র এবং দুর্বল-অসহায় মানুষ। হে আমিরুল মুমিনীন! সে আপনার দরবারে বসার মতো লোক নয়, আপনার কাছে সে আলোচিত হওয়ার মতোও নয়। এমনকি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো লোকও সে নয়।

উমার رضي الله عنه কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, হে বৃদ্ধ আমি তোমার এসব কথা শুনতে চাই না। তোমার এই ভাগ্নে যার কথা তুমি বলছো সে কি তোমাদের সাথে এবার হজ্ব করতে এসেছে? সে কি হারামে আছে? বৃদ্ধ লোকটি বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! সে আমাদের সাথে আছে। কিন্তু সে আরাফার মাঠের নিকটস্থ মাঠে আমাদের উটগুলো চরাচ্ছে।

উমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه এবং আলী ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه তাদের গাধায় চড়ে দ্রুত মক্কা ত্যাগ করলেন এবং আরাফাতের মাঠে গিয়ে গাছপালার মধ্যে তাকে খুঁজতে লাগলেন। তারা তাকে সেখানে দেখতে পেলেন দুটি সাদা পশমী পোশাক পরে দাঁড়িয়ে একটি গাছ সামনে রেখে সালাত আদায় করছে। তার দৃষ্টি স্থির ছিল সিজদার স্থানের দিকে। তার হাত দু'টি তার বুকের ওপর ছিল। ঐদিকে তার উটগুলো তার চারপাশে চরছিল। উমার আলীকে বললেন, হে আবুল হাসান, যদি পৃথিবীতে উওয়াইস আল-কারনী বলে কেউ থাকে, তাহলে এই হবে সেই ব্যক্তি।

তারপর তারা গাধা থেকে নেমে তার কাছে গেলেন। উওয়াইস তাদের কথা শুনে তার সালাত সংক্ষিপ্ত

❖ *সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিছ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।*

করতে লাগলেন। অতঃপর আত্তাহিয়াতু, শাহাদাত ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরালেন। তারা তার কাছে এসে বললেন, আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উওয়াইস উত্তর দিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি একজন উটের রাখাল এবং মজুরীর বিনিময়ে লোকদের উটের রাখালি করি। উমর বললেন, আমি তোমাকে উটের রাখাল হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না। আমি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করছি। আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন! তিনি বললেন, আমি আল্লাহর এক বান্দা এবং তাঁর এক বান্দির পুত্র। উমর বললেন, আমরা জানি, আসমান ও যমীনের সকলেই আল্লাহর বান্দা। আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং বান্দীদের পুত্র। কিন্তু আমরা তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার মা তোমাকে যে নাম দিয়েছে, তা আমাদেরকে বলো। তিনি বললেন, আপনারা আমার কাছ থেকে কী চান? আমি উওয়াইস বিন আমের। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার বাম দিকটা একটু দেখাও। তিনি বললেন, কী দরকার? আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছে তোমার বর্ণনা দিয়েছেন এবং আমরা তোমাকে ঠিক তেমনই পেয়েছি। তবে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, তোমার বাম দিকে এক দিনার বা দিরহামের মতো সাদা দাগ রয়েছে। আমরা তা দেখতে চাই। তিনি তার বাম দিকের চিহ্নটি দেখালেন। আলী এবং উমার সাদা দাগটি দেখলেন এবং বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই উওয়াইস আল-কারনী! তারপর তারা দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন এবং বললেন, হে উওয়াইস! আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন তোমাকে সালাম জানাই এবং আমাদের জন্য তোমাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলি। সুতরাং তুমি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন যে, তুমি তাবিঈনদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং তুমি কিয়ামতের দিন রাবি'আ ও মুদার গোত্রের সমান সংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে। এটা শুনে উওয়াইস দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, হয়তো সেই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে; আমি নই। আলী বললেন, আমরা নিশ্চিত যে, তুমিই সেই ব্যক্তি; এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তখন উয়াইস বললেন, আমি নিজের জন্য অথবা অন্য মানুষের জন্য আলাদাভাবে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করি না; বরং আমার দু'আ জলে, স্থলে, রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোতে বসবাসকারী সকল মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারী সকলের জন্য। কিন্তু আপনারা কে? আল্লাহ আপনাদের ওপর দয়া করুন? আমি আমার অবস্থা আপনাদেরকে জানিয়েছি এবং আমি চাইনি যে, অন্য কেউ আমার অবস্থান সম্পর্কে জানুক। আলী বললেন, ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব এবং আমি আলী ইবনে আবি তালিব। উওয়াইস আনন্দে লাফিয়ে তাদের আলিঙ্গন করলেন, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ আপনাদের উভয়কে মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারা বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারপর উয়াইস বললেন, আমার মতো কেউ কি আপনাদের মতো কারো জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে? তারা উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমরা তোমার দু'আর প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী। তাই দয়া করে আমাদের জন্য দু'আ করো। যাতে তোমার দু'আয় আমরা 'আমীন' বলতে পারি। উওয়াইস তখন মাথা তুলে বললেন, হে আল্লাহ! এই দুইজন তোমার জন্য আমাকে ভালোবাসে এবং তারা আমার কাছে দু'আর দরখাস্ত করছে। অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের নবী মুহাম্মদের সুপারিশে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হে উওয়াইস! তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো, যতক্ষণ না আমি মক্কায় গিয়ে আমার বেতন থেকে তোমার জন্য কিছু খাবার এবং আমার নিজের পোশাক থেকে কিছু অতিরিক্ত পোশাক নিয়ে আসি। আমি দেখছি তুমি খুবই দরিদ্র। আগামীকাল এই জায়গাতেই আমরা তোমার সাথে

সাক্ষাৎ করবো। উওয়াইস উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাদের এই চুক্তিতে সম্মত নই। আজকের পর আমি আপনাদেরকে দেখবো না। আর আপনারাও আমাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না। আমার খাবারের কী প্রয়োজন হবে? পোশাকের কী দরকার হবে? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমি একটি পশমী লুঙ্গি এবং একটি পশমী চাদর পরে আছি? কখন এগুলো পরিধান করে পুরাতন করবো? আমি এগুলো পুরাতন হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবো কি না, তা আমার জানা নেই? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমার জুতাগুলো সেলাই করা আছে? কখন এগুলো জীর্ণ করবো? আমি কি এগুলো নষ্ট হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবো? আমার কাজ থেকে আমি চার দিরহাম উপার্জন করেছি। কখন এগুলো খরচ করে শেষ করবো? আমি কি এগুলো শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবো?

উমার ইবনুল খাত্তাব উওয়াইসের কথাগুলো শুনে মাটিতে চাবুক মারলেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, হায়! উমারের মা যদি উমারকে জন্ম না দিতো! হায়! সে যদি বন্ধ্যা হতো এবং উমারকে প্রসব করার কষ্ট না করতো! উওয়াইস বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি এখন যাচ্ছি, আপনিও চলে যান। এই বলে উওয়াইস তার উটগুলো চালিয়ে এগিয়ে গেলেন, আর উমার ও আলী তাকে লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর উমর ও আলী মক্কার দিকে ফিরে গেলেন।

উওয়াইস আল-কারনীর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ،

“তাবেঈদীর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন, উয়াইস। সে আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন। নবী ﷺ উমারকে বলেছিলেন, হে উমার তুমি যখন তাকে পাবে, তখন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলবে। উয়াইসের ফযীলতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, উমার رضي الله عنه বলেন,

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»

“আমি আল্লাহর রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি: তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো উওয়াইস। তার মা বেঁচে আছে এবং তার শরীরে সাদা দাগ রয়েছে। তাকে পেলে তাকে বলো, সে যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে”।[৪]

উসাইর ইবনে জাবির হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন ইয়ামানের সৈন্যবাহিনী উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে আসতো, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করতেন: উয়াইস বিন আমির কি তোমাদের মধ্যে আছে? পরিশেষে একবার উওয়াইস যখন আসলেন, তখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি উয়াইস বিন আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি মুরাদর গোত্রের, তারপর কারন্ গোত্রের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার কুষ্ঠরোগ ছিল এবং তুমি তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছো, কেবল এক দিরহাম পরিমাণ দাগ বাকী আছে? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার কি মা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উমার বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, উওয়াইস বিন আমির তোমাদের কাছে ইয়ামানের লোকদের কাছ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবেন। তার কুষ্ঠরোগ ছিল, কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। তবে এক দিরহাম পরিমাণ দাগ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তার মা ছিল, যার সাথে তিনি সদয় আচরণ করেন। যদি তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন, তাহলে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন। তাই তুমি যদি তাকে দিয়ে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারো, তাহলে তাই করো। অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উমার তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফায় যেতে চাই। উমার বললেন, আমি কি তোমার জন্য এর গভর্নরকে চিঠি লিখবো? তিনি বললেন,

[৪] সহীহ মুসলিম হা : ২৫৪২।

আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। পরের বছর কুফাবাসীদের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্য থেকে একজন হজ্জ করতে এলো এবং উমারের সাথে দেখা করলো। উমার তাকে উওয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি তাকে একটি জীর্ণ বাড়িতে রেখে এসেছি যেখানে খুব কম জিনিসপত্র ছিল। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, উওয়াইস বিন আমির তোমাদের কাছে ইয়ামান থেকে সাহায্য নিয়ে আসবেন। তার কুষ্ঠরোগ ছিল, কিন্তু তিনি তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন, কেবল একটি জায়গা ছাড়া। তার মার প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। যদি তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন, তাহলে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন। যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলো। অতঃপর কুফাবাসী লোকটি হজ্জ থেকে গিয়ে উয়াইসকে বললো, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। উয়াইস বললেন, তুমি সম্প্রতি একটি নেক সফর থেকে ফিরে এসেছো। তাই তুমিই আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। কুফাবাসী লোকটি আবার বললো, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। উয়াইস বললেন, তুমি সম্প্রতি একটি নেক সফর থেকে ফিরে এসেছো, তাই তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর উয়াইস বললেন, তুমি কি উমারের সাথে দেখা করেছো? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে। অতঃপর লোকেরা তার ব্যাপারটি জেনে ফেললো। তাই তিনি উধাও হয়ে গেলেন। এরপর কখনো তাকে দেখা যায়নি।

উওয়াইসের জীবনী থেকে কতিপয় শিক্ষা :

১. উওয়াইস ছিলেন আল্লাহর এমন একজন গোপন ওলী, যিনি মানুষের মাঝে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন না।

২. যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে আমাদের না বলতেন, তাঁর বর্ণনা না দিতেন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন চিহ্নিত না করতেন, তাহলে কেউ তাঁকে চিনতো না।

৩. তিনি নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় বেঁচে ছিলেন।

৪. তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যদিও তিনি তাঁকে কখনও দেখেননি। তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

৫. তার ঘটনাটি নবী ﷺ এর নবুওয়াতের অন্যতম প্রমাণ।

৬. মর্যাদাবান লোকদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে।

৭. যার প্রশংসা করা হলে ফিতনা আশঙ্কা থাকে না, তার প্রশংসা করা বৈধ।

৮. আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণ অহংকারী হন না।

৯. সৎকাজের সফরের ফযীলত রয়েছে। এমন সফর থেকে যে ব্যক্তি ফিরে আসে, তার দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

১০. ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রার্থনা চাওয়া বৈধ।

১১. যার কাছে দু'আ চাওয়া হবে, সে দু'আর আবেদনকারীর চেয়ে কম মর্যাদাবান হলেও তার কাছে দু'আ চাওয়া যাবে। কারণ, উমার ও আলী উওয়াইসের চেয়ে বেশি মর্যাবান হওয়া সত্ত্বেও তারা উওয়াইসের কাছে দু'আ চেয়েছেন।

১২. এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ মানুষের বিচারের মাপকাঠি হলেও আসমানে তা মূল্যায়নের মাপকাঠি নয়।

১৩. উওয়াইস মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ না হয়েও তার জীবনীর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে করে গেছেন তার জন্য মুসলিমগণ কিয়ামত পর্যন্ত তাকে স্মরণ করবে এবং তাঁর জন্য দু'আ করবে।

১৪. পৃথিবীতে অনেক লোক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; কিন্ত আকাশে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

১৫০. পৃথিবীতে অনেক লোক অপরিচিত; কিন্তু আকাশে ও জান্নাতে সে বিখ্যাত!

১৬. মায়ের সেবা ও সম্মান করা মানুষের মর্যাদা বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়।❑❑

নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন?

ড. রেজাউল করিম মাদানী❖

১. মাযহাব মানার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে নেই :

এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক মুসলিমকে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়, সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। এই দুটিতে যা এসেছে তা মানতে হবে। সেই অনুযায়ী জীবন যাপন, সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতসহ সকল প্রকার ইবাদত করতে হবে। কারণ কুরআন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত এমন গ্রন্থ, যাতে কোনো প্রকার ভেজাল নেই। নেই কোনো প্রকারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন। নির্ভেজাল এক ঐশী গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, মানব জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী, মানব জাতির জন্য যা প্রয়োজন সব কিছুর বর্ণনাকারী, সর্বোপরি এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, পরলৌকিক মুক্তির একমাত্র উপায়।

আল্লাহ্ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“রামাযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।” [৫]

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত মুসলিমদের জন্য। [৬]

আর সুন্নাত হচ্ছে, রাসূল ﷺ এর কথা, কাজ ও সম্মতি। যা পরিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হিসেবে প্রমাণিত। আর এ সুন্নাত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় উৎস। যা থেকে ধর্মীয় কার্যাদির বিষয়ে দলীল প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। আর এ সুন্নাতই হচ্ছে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাকারী। অতএব, একজন মুসলিম, মুমিন ব্যক্তির উচিত হবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাতে যা এসেছে, তার অনুসরণ করা এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তি অর্জন করা; আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [৭]

আর রাসূল ﷺ তার বিশ্বখ্যাত ভাষণ, বিদায় হাজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবার সামনে সকল মুসলমানের করণীয় কি সে সম্বন্ধে বলেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি এ দুটি জিনিষকে আঁকড়ে ধরলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। (১) আল্লাহ্‌র কিতাব (২) রাসূলের সুন্নাত।” [৮]

কুরআন, সুন্নাহ ইসলামের মূল উৎস। তাইতো দেখা যায় সাহাবাগণ, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণসহ সকল ইমাম বলে গেছেন। কুরআন সুন্নাহতে যা এসেছে, এ দুয়ে যা ধর্মীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, সেগুলোকে আঁকড়ে ধর। আর এ দুয়ের পরিপন্থী, বিপরীত ও সাংঘর্ষিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান কর। তাদের সকলে একবাক্যে বলে গেছেন তোমরা একমাত্র মাসুম, নির্ভুল, ওহিপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তি মুহাম্মাদ

❖ প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী বাংলাদেশ।

[৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫।

[৬] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৮৯।

[৭] সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৭১।

[৮] মিশকাতুল মাছাবীহ, কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার অধ্যায়। মুআত্তা-ইমাম মালেক। আত-তামহীদ, হা : ৩২।

ﷺ এর সকল (সহীহ) কথা, কাজ কর্ম, চালচলন, প্রথা, হুকুম-আহকাম বিনা দ্বিধায় অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে যারা মাছুম, নির্ভুল, নির্দোষ, ওহিপ্রাপ্ত না, তাদের সকল কথা, মতামত, রায় নির্দ্বিধায় মানা যাবে না। রবং যাচাই বাছাই করে যা কুরআন, সুন্নাহর সাথে মেলে সেগুলো গ্রহণ কর, আর যা সাংঘর্ষিক সেগুলো প্রত্যাখ্যান কর। অথচ মুকাল্লিদ, মাযহাবপন্থী ভাইদের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ তারা যে মাযহাব মানছেন, যেভাবে অন্ধানুকরণ ও গোঁড়া তাকলীদ করে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে কোনো দলীল না আছে কুরআনে, না আছে হাদীসে রাসূলে, না তাদের ইমামগণ এভাবে মাযহাব মানতে এবং অন্ধ তাকলীদ করতে বলে গেছেন।

রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীকে সাক্ষী করে বলে গেছেন, তিনি এ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করে গেছেন। রাসূল ﷺ যখন এ কথা বলেন যে, দ্বীন ইসলাম আজ পরিপূর্ণ, তখন কিন্তু মাযহাবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না এ সকল মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামগণের। তাহলে মাযহাব মানা কিভাবে ধর্মীয় কাজ তথা ওয়াজিব হতে পারে?

২. সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈর যুগে মাযহাবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর অনুসরণীয় সকল ইমাম মাযহাব মানতে নিষেধ করেছেন।

এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ, তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপর আশারায়ে মুবাশশারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বা দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, তারপর বদরী সাহাবীসহ লক্ষাধিক সাহাবী। তাদের যুগে মাযহাবের নাম নিশানা, অস্তিত্ব কিছুই ছিলো না। ঐ সকল উত্তম ব্যক্তিবর্গ আমাদের চেয়ে দ্বীনের কাজে, কল্যাণের কাজে অনেক এগিয়ে ছিলেন, ছিলেন আগ্রহী। ইমরান বিন হুসাইন রা : থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন :

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

“আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের লোক, অতঃপর তারপরবর্তী যুগের লোক অর্থাৎ (তাবেঈগণ), অতঃপর তারপরের যুগের লোক (তাবে তাবেঈগণ)।” [৯]

রাসূল ﷺ যে যুগকে উত্তম যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন, যে মানুষদেরকে উত্তম মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিলেন, তাদের সময় এ মাযহাব নামক বিষয়টির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এমনিভাবে ছিল না কোনো ব্যক্তি তাকলীদ, আর থাকবেই বা কেন? আল্লাহতো মুসলিমদেরকে কুরআন হাদীসের অনুসরণকারী হতে বলেছেন, কোনো মাযহাবী নাম ধারণ করতে বলেননি, বরং তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর সাহাবীদের যুগে, তাবেঈদের যুগে, তাবে তাবেঈদের যুগে কোনো ব্যক্তি তাকলীদ বা তাকলীদে শাখছী ছিল না বলেই তো, কাউকে বলা হতো না, আবু বকরী অর্থাৎ আবু বকরের অনুসারী, উমারী অর্থাৎ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অনুসারী, উসমানী অর্থাৎ উসমানের অনুসারী, যেমনিভাবে এখন কিছু কিছু মুসলিম ভাইদেরকে দেখা যায় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী হাম্বলী বলতে। শুধু বলেন না বরং এ মাযহাবী পরিচয় টিকিয়ে রাখতে, বাঁচিয়ে রাখতে অনেক হাদীস পরিবর্তন ও অমান্য করছেন, আবার অনেক হাদীসের অপব্যাখ্যাও করছেন। যার অনেক উদাহরণ, আপনারা “অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম” অধ্যায়ে দেখেছেন। তারপরও এখানে কিছু উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হল। যদি কোনো মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলেন : সলাতে হাত বুকের ওপর বাঁধতে হবে, সহীহ বুখারীর হাদীস। তারা বলবেন, নাভির নীচে বাঁধা আমাদের মাযহাবের কথা। যদি বলেন, সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম, বুখারী মুসলিমের হাদীস, যদি বলেন : সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম। সলাতে এক মুসল্লি অপর মুসল্লির পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো বুখারী মুসলিমের হাদীস, তারা বলবেন, এটা আমাদের মাযহাবে নেই। যদি বলেন, ইমামের খুতবারত অবস্থায় দু'রাক'আত সলাত পড়ে তারপর মসজিদে বসতে হবে, এটা বুখারী মুসলিমের হাদীস,

[৯] সহীহ বুখারী, সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় ৭খ : হা : ৩৬৫০ সহীহ মুসলিম, সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায়, ৮ খ : হা : ২৫৩৩।

তারা বলবে, আমাদের মাযহাবে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় আসলে সলাত পড়া নিষেধ ইত্যাদি।

আর যে সকল মহামতি ইমামের নামে মাযহাব বানিয়ে এ দলাদলি, ফির্কার, ফিতনার সৃষ্টি, তারা কিন্তু সকলে এ কাজ তথা মাযহাব মানা ও ব্যক্তি তাকলীদ করা থেকে নিষেধ করে গেছেন বরং নাজায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর বলে গেছেন, যখন কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, সেটাই আমার মাযহাব। সহীহ হাদীস মানা তাদের মত, তাদের আদর্শ। কিন্তু মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা সম্পূর্ণ উল্টো। তাছাড়া সকল অনুসৃত মহামতি ইমাম বলে গেছেন, যখন তাদের কথা, কাজ, রায়, ইজতেহাদ, ফতোয়া কুরআন, হাদীসের বিপরীত হবে, তখন তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে কুরআন হাদীসের কথা মানতে।

আর মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মহামতি চার ইমাম শুধুমাত্র মুজতাহিদ ছিলেন। ওহীপ্রাপ্ত বা মাসুম ছিলেন না। যে, সকল মাসআলায় তাদের সকল কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। বরং মুজতাহিদ ব্যক্তি কখনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আবার কখনো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আর যার সকল কথা নির্দিধায় মানতে হবে, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। পরিশেষে ইমাম মালেক রহ: এর একটা উক্তি উল্লেখ করে শেষ করব। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের যুগে যে কাজ ধর্মের কাজ হিসেবে পরিগণিত ছিল না, তা কখনো ধর্মের কাজ হতে পারে না। তিনি আরো বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেভাবে কুরআন, হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়েছিলেন, তা ব্যতীত পরবর্তী উম্মাতগণ কখনো শুদ্ধ হতে পারে না।

৩. মাযহাব সম্পর্কে না জিজ্ঞাসা করা হবে কবরে, না জিজ্ঞাসা করা হবে কিয়ামতের দিন।

ইসলাম এমন ধর্ম, মুসলিম এমন জাতি, যাদেরকে তাদের সকল কাজ, কর্ম, ব্যবসা, বাণিজ্য, চলা-ফেরা, ইবাদত, সকল প্রকার কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। হোক সে জিজ্ঞাসা কবরে ফেরেশতাদের নিকটে অথবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা তাদের কৃত কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।" [১০]

আর যে সকল বিষয়ে ফেরেশতাগণ কবরে জিজ্ঞাসা করবেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন, সেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তার মধ্যে কিন্তু মাযহাব নেই। অর্থাৎ মাযহাব মেনেছেন কিনা? এ বিষয়ে কেউ কোথাও জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু কিছু কিছু মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা অযথা মাযহাব মানাকে ওয়াজিব বলছেন। অথচ ওয়াজিব তো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়। যেমন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ: ইমাম ইবনুল হুমাম রহ: বলেন : إنما الواجب ما اوجب الله ورسوله. ওয়াজিব হচ্ছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওয়াজিব করেছেন। [১১]

অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ মাযহাব মানা ওয়াজিব করেননি। মুসলিমরা যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসিত হবেন এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে। রাসূল থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন :

فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ : مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : اللَّهُ، فَيَقُولُونَ : مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُونَ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ،...

কবরে ফেরেশতাগণ এসে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার প্রভু কে? রাসূল ﷺ বলেন : উক্ত ব্যক্তি বলবে, আমার প্রভু আল্লাহ্। অতঃপর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার ধর্ম কী? সে বলবে : আমার ধর্ম ইসলাম। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে বলবেন : এ ব্যক্তি কে যিনি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন? রাসূল ﷺ বলেন, তখন সে বলবে : উনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তখন ফেরেশতারা

[১০] সূরা আম্বিয়া আয়াত : ২৩।
[১১] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম,

বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে : তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে : আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি ও সত্যজ্ঞান করেছি । [১২]

অপর বর্ণনায় এসেছে :

فَيَقُولاَنِ لَهُ : صَدَقْتَ، كَذَلِكَ كُنْتَ، فَيُقَالُ : افْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَاكْسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى أُخْبِرَ أَهْلِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ : اسْكُنْ "

"যখন সে পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ে উত্তর দিতে পারবে, তখন তাকে বলা হবে ঠিক বলেছো, তাকে বলা হবে, জান্নাতের শয্যা ও জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও, তখন সে বলবে আমাকে একটু সুযোগ দাও যাতে এ খবর আমি আমার পরিবার পরিজনকে দিয়ে আসি। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি এখানে বাস কর।" [১৩]

পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য যে বিষয় মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্বন্ধেও অনেক হাদীস বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। তন্মধ্যে হাদীসে আবি বারজাতা আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস।

উক্ত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ عَمِلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ»

"কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা সামনে একটুও বাড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চারটি বিষয়ে উত্তর দেবে (১) তার বয়স বা জীবন সম্বন্ধে, সে কিভাবে তার বয়স বা জীবনকে অতিবাহিত করেছে (২) তার অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে, সে তার ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কিনা (৩) তার ধনদৌলত সম্বন্ধে, কিভাবে সে তার ধন সম্পদ অর্জন করেছে, আর কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছে (৪) তার শরীর সম্বন্ধে, সে তার শরীরকে কিভাবে ব্যবহার করেছে।"[১৪]

তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল, মাযহাব নামক অনর্থক, নিস্প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি, মাতামাতি করা ঠিক না। কারণ এ বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। যে সকল বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে, সে সকল বিষয় শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি না, কুরআন, হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে, বিবেচনা করতে হবে। আর যদি কুরআন, হাদীস অনুযায়ী না হয়, তাহলে কুরআন হাদীস দ্বারা সে সকল বিষয়কে মিলিয়ে নিতে হবে। যাতে আমরা কবরেও কিয়ামত দিবসে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন! (চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

পত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ :

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

পিডিএফ ফাইল পেতে নিম্নে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

[১২] আল মুসতাদরাক আলা সহীহাইন, হাকেম, আরো দেখুন : আল মুজামুল আওছাত, তারবানী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ , তাহজীবুল আছার, তাবারী মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

[১৩] সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ।

[১৪] সুনানে তিরমিযী, হিসাব ও কিসাস অধ্যায়। আরো দেখুন সুনানে দারেমী, মুসনাদে বাজজার, আল মুজামুল কাবীর, তাবরানী।

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(৭ম পর্ব)

চার ইমাম ও কুরআনবাদ মতবাদ : চার ইমাম যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আশ শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা দীনের অতন্দ্র প্রহরী। তারা সকলেই হাদীসের একান্ত অনুসারী এবং সুন্নাহর পক্ষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হিসেবে সারা বিশ্বে তারা সমাদৃত, প্রসিদ্ধ ও মর্যাদবান। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছে তারা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। নিজ নিজ সময়কালে কুরআনবাদের বিরুদ্ধে তাদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কঠোর ভূমিকা রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও কুরআনবাদ : আবু হানিফা আন নু'মান বিন আস-সাবিত আত তাইমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), যিনি ইমাম আবু হানিফা নামেই সুপরিচিত, ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মুসলিম মিল্লাতের একজন প্রখ্যাত ইমাম ও ফকীহ এবং তিনি ইমামে আ'যাম নামে খেতাবপ্রাপ্ত। একদা হাদীসের পাঠ চলাবস্থায় এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে আসলো এবং হাদীসের দারস দেখে সে বললো; আমাদের কাছে এ সকল হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকুন। তখন ইমাম আবু হনিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধমক দিলেন এবং বললেন;

لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، ثم قال للرجل : ما تقول في لحم القرد، وأين دليله في القرآن؟ فأفحم الرجل فقال له : فما تقول أنت فيه؟ فقال : ليس هو من بهيمة الأنعام.

সুন্নাহ বা হাদীস যদি না থাকতো তাহলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতো না। তারপর তিনি উক্ত লোককে বললেন; বানরের গোশত সম্পর্কে তুমি কী বলো এবং কুরআন থেকে তার দলীল কী? এরপর লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো এবং বললো; আপনি এ বিষয়ে কী বলেন? উত্তরে তিনি বললেন; বানর গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী নয়।[১৫]

আর এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুন্নাহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে অবস্থান, সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরে নিতে চাওয়ায় তাকে কঠোরভাবে ধমকালেন এবং সুন্নাহর আবশ্যকতাও প্রমাণ করলেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি বললেন; হাদীস ব্যতীত দুনিয়ার কারো জন্যই কুরআন বুঝা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন;

إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأى، وعليكم بإتباع السنة، فمن خرج عنها ضل.

তোমরা আল্লাহর দীনের মধ্যে রায় বা মতামতের ভিত্তিতে কথা বলা থেকে বিরত থাকো, তোমরা সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ পরিত্যাগ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।[১৬]

ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও কুরআনবাদ : ফাকীহুল উম্মাহ খ্যাত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), যিনি ইমাম শাফেঈ নামেই মুসলিম মিল্লাতের কাছে সুপরিচিত। তিনি ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের গাযা কিংবা আসকালান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ১০ বছর বয়সে তিনি মক্কায় গমন করেন। কুরআনবাদের বিরুদ্ধে তিনি একাধিক বাহাস ও মুনাযারা করেছেন এবং এ মর্মে তার একাধিক গ্রন্থও রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো জিমাউল ইলমি (جماع العلم), আর তাতে তিনি একটি অধ্যায় রচনা করেছেন : باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها অধ্যায়: যারা সকল খবর বা হাদীস অস্বীকার করে তাদের বর্ণনা।[১৭]

আব্দুল্লাহ বিন সালিহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যিনি ইমাম আল লাইস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অনুসারী ছিলেন, তিনি বলেন; একদা আমরা ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দারসে উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমাদেরকে হাদীসের অপরিহার্যতা শীর্ষক দারস প্রদান করলেন এবং আমরা তা লিখে নিলাম। এরপর আমরা এটা জাহমিয়াদের একজন বড় ইমাম ইবরাহীম বিন উলাইয়্যার

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[১৫] কাওয়ায়িদুত তাহদীস ফি ফুনুনি মুস্তালাহুল হা : ৫৬পৃ.।
[১৬] কাওয়ায়িদুত তাহদীস ফি ফুনুনি মুস্তালাহুল হা : ৫২পৃ.।
[১৭] জিমাউল ইলমি : ৫পৃ.।

কাছে পেশ করলে তিনি হাদীসের (খাবারে ওয়াহেদ) এর আবশ্যকতা বাতিল করার জন্য দলীল পেশ করতে লাগলেন। এ বিষয়টি ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন;

إن ابن علية ضال،قعد بباب الضلال يضل الناس.

নিশ্চয়ই ইবনে উলাইয়্যা পথভ্রষ্ট সে ভ্রষ্টতার পথে বসেছে এবং মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

তিনি আরো বলেছেন; যে ব্যক্তি হাদীস লিখে রাখে তার দলীল মজবুত হয়।[১৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও কুরআনবাদ : ফাকীহুল উম্মাহ, মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমাম খ্যাত-আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল আয যুহাইলী আশ শাইবানী; যিনি আহমাদ বিন হাম্বল নামেই মুসলিমদের মাঝে সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত। তিনি আব্বাসীয় যুগে ইরাকের বাগদাদে ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সেই সময়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকা ও হাদীস অস্বীকারকারীদের জন্য ছিলেন জমদূতের মতো আতঙ্ক। কুরআনুল কারীম সৃষ্ট না কি তা কালামুল্লাহ বা সিফাতুল্লাহ এ বিষয়েও তিনি অত্যন্ত শক্ত পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তিনি হাদীস অস্বীকারকারীদের সঙ্গে সরাসরি বাহাস-মুনাযারা (বিতর্কে) অংশগ্রহণ করতেন।

সালিহ বিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন; জনৈক জাহমিয়্যা কুরআনবাদীর সাথে মুনাযারার এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে কুরআনবাদী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে বললো;

فَقَالَ رجل مِنْهُم أَرَاك تذكر الحَدِيث وتنتحله،قَالَ فَقلت لَهُ مَا تَقول فِي قَول الله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}،فَقَالَ خص الله بهَا الْمُؤمنِينَ،قَالَ فَقلت لَهُ مَا تَقول إِن كَانَ قَاتل أَو كَانَ قَاتلا عبدا يهوديا أَو نصرانيا ،قَالَ فَسكت،قَالَ أبي وانما احتججت عَلَيْهِ بِهَذَا لانهم كَانُوا يحتجون عَليّ بِظَاهِر الْقُرْآن وَبِقَوْلِهِ أَرَاك تنتحل الحَدِيث.

আমি দেখছি যে, আপনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তা সংরক্ষণও করেন!! তখন আমি তাকে বললাম; তুমি আল্লাহর এই কথার ব্যাপারে কী বলবে- আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ছেলেদের জন্য দুইজন কন্যা সন্তানের সমান অংশ নির্ধারণ করেছেন।[১৯]

তখন সে বললো এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের নির্দিষ্ট করেছেন। এরপর তিনি বললেন; যদি সে হত্যাকারী হয় কিংবা দাস হয় অথবা ইহুদী কিংবা নাসারা হয়-তখন তার বিধান কী হবে? এরপর জাহমিয়্যা ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো। অপঃপর আমার বাবা (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল) বললেন; আমি তাদের বিরুদ্ধে (সরাসরি হাদীস উল্লেখ না করে) এভাবে দলীল দিয়েছি কারণ, তারা আমাকে শুধু কুরআন থেকে দলীল দিতো।[২০]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো জাহমিয়্যারা হাদীস অস্বীকার করতো বিধায় তারা হাদীস থেকে দলীল পেশ করতো না এবং হাদীস থেকে কোনো দলীল গ্রহণও করতো না। আর সেই জন্য ইমাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কুরআনের আয়াত উল্লেখ পূর্বক এটা প্রমাণ করলেন যে, সুন্নাহ ছাড়া কুরআনের বিধান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ হাদীস অনুযায়ী কাফের ও মুসলিম পরস্পর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না এবং পিতামাতার হত্যাকারী ব্যক্তিও তাদের সম্পত্তির কোনো ওয়ারিস হতে পারবে না। যা কুরআনের বাহ্যিক বিধান থেকে কোনোভাবেই বুঝা সম্ভব নয়, বিধায় হাদীসের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

এ ছাড়া ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাহ কুরআনবাদীদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে কিতাবও রচনা করেছেন।[২১]

এছাড়াও ইমাম মালিক, ইমাম বাইহাকীসহ আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সকলেই ভ্রান্ত ফিরকা কুরআনবাদীদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন ও বাহাস মুনাযারা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে বিশুদ্ধ মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে কুরআনবাদ : কুরআনবাদের ষড়যন্ত্র প্রতিটি যুগেই চলমান ছিলো। আমরা ইতঃপূর্বে

[১৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১০/২৪পৃ.।

[১৯] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১১।

[২০] সিরাতুল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল : ১/৫৯ পৃ.।

[২১] ই'লামুল মুকিঈ'ন : ২/২০৭ পৃ. আল কুরআনিয়্যুনা ফিল আরাব : ৬৮পৃ.।

হিজরীর ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে কুরআনবাদের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। চতুর্থ শতাব্দীতেও হাদীস অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্র ব্যাপক গতিশীল ছিলো। সেই যামানার উলামাগণও কুরআবাদীদের ষড়যন্ত্র ও ভ্রান্তি প্রকাশে অত্যন্ত সরব ছিলেন। সেই সময় কুরআনবাদের বিরুদ্ধে যারা সব থেকে বেশি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম হলেন; মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ- আবু বকর আল আজিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তিনি আল আজিরী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তিনি শাফেঈ মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফক্বীহ ছিলেন। তিনি ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৩০ হিজরীতে সেখান থেকে মক্কায় আগমন করেন। ৩৬০ হিজরীতে তিনি মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার অনেকগুলো লিখনী রয়েছে- তন্মধ্যে "আশ শারীয়া'হ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি একটি অধ্যায় রচনা করেছেন ;

بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ طَوَائِفَ يُعَارِضُونَ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وينكرون أشد الْإِنْكَارِ-

অধ্যায় : যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহকে কিতাবুল্লাহর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে এবং তা কঠোরভাবে অস্বীকার করে তাদের থেকে সতর্ক থাকা। উল্লেখিত অধ্যায়ে আল আজিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন; যখন উলামাগণ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কোনো হাদীস বর্ণিত হবে, অতঃপর কোনো মুর্খ ব্যক্তি বলবে, আমি কিতাবুল্লাহতে যা আছে তা ব্যতীত এসব কোনো হাদীস মানি না। তখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাকে বলতে হবে; তুমি খারাপ লোক, তুমি মুর্খ লোক আর তোমার ব্যাপারেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক করেছেন এবং তোমার ব্যাপারেই উলামাগণ সাবধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ফরযগুলো মুজমাল (অস্পষ্ট) অবতীর্ণ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

হে নবী! আমরা তোমার কাছে কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি যা তাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করো।[২২]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর বাণীর বর্ণনাকারী বা ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এবং সকলকেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। "রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।[২৩]

এই শতাব্দীর আরো একজন বিখ্যাত বিদ্বান ছিলেন যিনি ভ্রান্ত মতবাদীদের জীবন্ত আতঙ্ক ছিলেন, তিনি হলেন; আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হামাদান- আবু আব্দুল্লাহ ইবনু বাত্তা আল উকবুরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), যিনি ইবুল বাত্তা নামেই সুপরিচিত। তিনি একাধারে বিজ্ঞ আলিমে-দীন, মুহাদ্দিস ও ফিক্বহে হাম্বালীর পন্ডিত ছিলেন। তিনি ৩০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার সংকলিত বিখ্যাত কিতাব "আল ইবানাতুল কুবরা"। তাতে তিনি অধ্যায় রচনা করেছেন;

﴿بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ طَوَائِفَ يُعَارِضُونَ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرْآنِ﴾

অধ্যায় : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর অনুসরণ ও যারা রাসূলের সুন্নাহকে আল্লাহর কিতাবের সাথে বিরোধপূর্ণ মনে করে তাদের থেকে সাবধানতার বর্ণনা। উক্ত অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন;

فَسَبِيلُ الْعَاقِلِ الْعَالِمِ إِذَا سَمِعَ قَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَا جَاهِلًا فِي الْحَقِّ، خَبِيثًا فِي الْبَاطِلِ..... يَا مَنْ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَرْضٌ عَلَيْكَ قَبُولُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَقَبُولِ سُنَّتِهِ.

কোনো জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান যখন এ ধরনের কথা (হাদীস অস্বীকারের) শুনবে তখন তার কর্তব্য হবে এটা বলা যে, ওহে সত্য সম্পর্কে মুর্খ ও সত্য গোপন করার ক্ষেত্রে অতি নিকৃষ্ট; তুমি যদি আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করে থাকো যে, নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত এবং আল্লাহর দেওয়া আদেশ ও নিষেধ মান্য করা ফরয, তাহলে জেনে রাখো; আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করা ও তার সুন্নাহ গ্রহণ করার আদেশ প্রদান করেছেন।[২৪] চলবে ইনশা-আল্লাহ

[২২] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৪৪।

[২৩] আশ শারী'আহ : ১/৪১০পৃ.।

[২৪] আল ইবানাতুল কুবরা : ১/২২৩, ২২৪ পৃ.।

সত্য চির অম্লান

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ❖

সত্যবাদিতা সকল অবস্থায় একজন মুমিনের পরিচায়ক এবং তার কথাবার্তায়, কাজে ও আচরণে এটি তার আচ্ছাদন। সত্যবাদিতা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তার স্বভাবের গভীরে প্রোথিত, এমনকি সত্যবাদিতা তার সহজাত চরিত্রে পরিণত হয় যা কখনোই তার থেকে পৃথক হয় না। তাই সে নিজেকে বিচার-বিবেচনা ও প্রমাণহীন কোনো কথা বলার সুযোগ দেয় না এবং মিথ্যা ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তও দেয় না। বরং সে সত্যকে অনুসন্ধান করে, সেটাকে কামনা করে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, অবশেষে আল্লাহর কাছে তাকে 'সিদ্দীক' তথা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এ মর্যাদা হলো নবুওয়াত ও শহীদি মর্যাদার মধ্যবর্তী এক মহান ও সুউচ্চ মর্যাদা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

'যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নে'মাত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!'[২৫]

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا.

'সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেককর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে, আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে অবশেষে আল্লাহর নিকটে সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।'[২৬]

অতএব সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হলো, ফলে আল্লাহও তাকে সত্যায়িত করলেন। সুসংবাদ তার জন্য, যে আল্লাহর বান্দাদের সাথে সত্যবাদী হলো, ফলে আল্লাহও তাকে সম্মানিত করলেন। আরো সুসংবাদ তার জন্য, যে সত্যবাদীদের পথে দৃঢ় রইল, অবশেষে আল্লাহও তাকে (এই অবস্থায়) মৃত্যু দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

'মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে (শাহাদাত বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি।'[২৭]

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে কা'ব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা ওজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা

❖ আরবী প্রভাষক, হানাইল নো'মানিয়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট।

[২৫] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৬৯।

[২৬] সহীহ মুসলিম হা : ২৬০৭।

[২৭] সূরা আহযাব আয়াত : ২৩।

দূর হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, এমন কোনো উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় মদিনায় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ-এর সামনে হাজির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এসো। আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি পেশের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহর কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহর কসম, আমার কোনো ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। এরপর যখন আল্লাহ কা'ব ইবনু মালিক ও তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে ফয়সালা করে দিলেন এবং তাঁদের ব্যাপারটি শেষ করলেন তাওবার মাধ্যমে, তখন কা'ব নবী ﷺ-এর কাছে এলেন, আর তিনি মসজিদে ছিলেন। কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার ওপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকী জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোনো মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নে'মাত আল্লাহ দান করেননি যে নে'মাত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এ আয়াত অবতীর্ণ করেন- لَقَدْ تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ 'আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নাবীর প্রতি।'[২৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'[২৯] [কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার ওপর এত

[২৮] সূরা আত-তাওবাহ আয়াত : ১১৭।
[২৯] সূরা আত-তাওবাহ আয়াত : ১১৯।

উৎকৃষ্ট নে'মাত আল্লাহ প্রদান করেননি, যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সঙ্গে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম।[৩০]

সত্যবাদিতা একটি মহান চরিত্র। মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে সত্যবাদিতার গুণে প্রশংসিত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا 'আল্লাহ অপেক্ষা আর কার কথা অধিক সত্য হতে পারে?'[৩১] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا 'আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?'।[৩২] রাসূলগণকে যেসব গুনে গুনান্বিত করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যবাদিতাই সবচেয়ে মর্যাদাকর গুন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا 'আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী।'[৩৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

'আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রাসূল, নবী।'[৩৪]

অতঃপর আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নবুওয়ত পূর্ববর্তী জীবনেও সৎ ও আমানতদার ছিলেন। এরপর তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন, সত্য সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং সত্যের উপর চলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিদাতা এবং অঙ্গীকারকারী। তাঁর রব তাঁকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সত্য দ্বারা শোভিত করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ভেতরে ও বাইরে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিতে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

'আর বল, "হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর"।'[৩৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরী'আত হলো সত্যের শরী'আত এবং তাঁর সাহাবীগণ হলেন সিদ্দীক্ব। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 'আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী।'[৩৬]

সত্যবাদিতা নিয়ত, কথা, কাজ ও চরিত্র প্রভৃত্তির মূল ভিত্তি। এটি অন্তরের প্রশান্তি ও মানসিক স্বস্তির উৎস। সত্য মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেয় এবং দু'আ কবুলের পথ সুগম করে। সত্যবাদী ব্যক্তি মাত্রই সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয় এবং মিথ্যাবাদীরা সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

এ কারণেই নবী করীম ﷺ মিথ্যাকে কঠোরভাবে নিন্দা করতেন, তা যত সামান্য বিষয়েই হোক না কেন। এমনকি তিনি শিশুদের কাছেও মিথ্যার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করতেন, যেন তারা ছোটবেলা থেকেই সত্যের ওপর বেড়ে ওঠে, সত্যকে ভালোবাসে এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করে ও তা পরিহার করে চলে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে এটা দিবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করছে? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ .

'যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হতো।'[৩৭]

---

[৩০] মুত্তাফাকুন আলাইহ, সহীহ বুখারী হা : ৪৪১৮; । সহীহ মুসলিম হা : ২৭৬৯।
[৩১] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৮৭।
[৩২] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১২২।
[৩৩] সূরা মারইয়াম আয়াত : ৪১।
[৩৪] সূরা মারইয়াম আয়াত : ৫৪।
[৩৫] সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত : ৮০।
[৩৬] সূরা আয-যুমার আয়াত : ৩৩।
[৩৭] আবু দাউদ হা : ৪৯৯১।

অতএব হে ভাই! মিথ্যার ব্যাপারে কোনো অবহেলা নয়। কারণ মিথ্যার দরজা একবার খুলে গেলে তা বন্ধ করা কঠিন হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .

‘তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।’[৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এমনকি কৌতুক বা বিনোদনের ছলেও মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের সঙ্গে রসিকতা করতেন; কিন্তু কখনোই সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ويلٌ للذي يُحدِّثُ فيكذِبُ ليُضحِكَ به القومَ، ويلٌ له، ويلٌ لهم ‘ধ্বংস তার জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তাদের জন্য।’[৩৯]

অর্থাৎ মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা এটিও গুরুতর অপরাধ। ইসলামে রসিকতা নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু তা অবশ্যই সত্যের ভিত্তিতে হতে হবে।

কাজেই মিথ্যার বিষয়টি যত বড় হয়, তার বিপদও ততো ভয়াবহ হয় এবং তার শাস্তিও গুরুতর হয়। বিশেষত আজকের ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের উপস্থিতি ও কোনো বিষয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার যুগে যেভাবে গুজব তৈরি ও প্রচার করা হয়- তা সমাজ ও তার নিরাপত্তার ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে যে, সে যেন শত্রুদের হাতের হাতিয়ার হয়ে না পড়ে এবং সে নিজের, তার সমাজের ও দেশের ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আর নবী ﷺ যাচাই-বাছাই ছাড়া খবর প্রচার করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেন, كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يُحدِّثَ بكل ما سمع ‘কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।’[৪০] তাহলে একবার ভাবুন তো! সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, যে নিজেই গুজব ও মিথ্যা ছড়ায়?! সে তো কঠোর শাস্তির ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

যেমনটি সহীহ বুখারীতে নবী ﷺ-এর স্বপ্নের বিবরণীতে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وأمَّا الرجلُ الذي أتيتَ عليه يُشَرْشَرُ شِدقُه إلى قفاه، ومنخرُه إلى قفاه، وعينُه إلى قفاه، فإنَّه الرجلُ يغدُو من بيتِه فيكذِبُ الكذبةَ تبلُغُ الآفاقَ.

‘অতঃপর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোনো মিথ্যা বলে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৪১]

এর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾

‘আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে পাবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান জাহান্নামের মধ্যে নয় কি?’[৪২] সহীহুল বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمدًا فليتبوَّ مقعدَه من النار ‘যে ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে জেচ দেন, আমীন

[৩৮] সহীহ মুসলিম হা : ২৬০৭।
[৩৯] মুসনাদে আহমাদ হা : ২০০৩৫; সনদ হাসান।
[৪০] সহীহ মুসলিম হা : ০৫।
[৪১] সহীহ বুখারী হা : ৭০৪৭।
[৪২] সূরা আয-যুমার আয়াত : ৬০।

ফেরেশতাদের দু'আপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মানুষ

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ ❋

ভূমিকা :

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি, যারা সর্বদা তাঁর আদেশ পালন করে এবং মুমিনদের জন্য রহমত কামনা করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে, যারা সর্বদা তাঁর হুকুম পালনে নিয়োজিত। মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত; তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেরেশতাদের ভূমিকা ও দু'আ আমাদের জীবনে আল্লাহর রহমত ও বরকত আনতে সহায়তা করে। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের আদর্শ অনুসরণ আমাদের ঈমান ও আমলকে দৃঢ় করে। সেই সম্মানিত ফেরেশতারা বিশেষ কয়েক শ্রেণীর মানুষের জন্য দু'আ করেন। ফেরেশতাদের দু'আপ্রাপ্ত সেই সৌভাগ্যবানদের কাতারে থাকার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের সবার জন্য উন্মুক্ত। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা প্রথম কাতারের জন্য দু'আ করেন।"[৪৩]

ফযীলত ও শিক্ষা : সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ালে, আল্লাহর বিশেষ রহমত ও ফেরেশতাদের দু'আ পাওয়া যায়।

প্রথম কাতারে সালাত পড়লে অধিক সওয়াব পাওয়া যায় এবং শয়তানের ধোকা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। মানুষ প্রথম কাতারের সওয়াব সম্পর্কে জানতে পারলে লটারি করতো। তাই মসজিদে আগে আগে উপস্থিত হওয়া উচিত।

আমাদের করণীয় :

✔ মসজিদে দ্রুত যাওয়া এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা।

✔ সালাতকে গুরুত্ব দিয়ে সময়মতো আদায় করা।

২. সালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ও সালাত শেষে বসে থাকা ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ

"যতক্ষণ কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করে, ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করেন : "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন, যতক্ষণ না সে অযূ ভঙ্গ করে বা অন্য কোনো অসঙ্গত কাজ করে।"[৪৪]

ফযীলত ও শিক্ষা :

সালাতের পর মসজিদে বসে থাকলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায় এবং ফেরেশতারা দু'আ করেন।

সালাত শেষে মসজিদে দীর্ঘ সময় থাকার ব্যাপারে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে।

এক সালাত শেষে আরেক সালাতের অপেক্ষা করাও ইবাদত হিসেবে গণ্য।

আমাদের করণীয় :

✔ সালাতের জন্য মসজিদে আগে আগে যাওয়া।

✔ সালাত শেষে কিছুক্ষণ বসে দু'আ ও যিকির করা

৩. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ব্যক্তি।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

❋ *আক্বীদাহ ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।*

[৪৩] আবু দাউদ হা : ৬১৮; ইবনে মাজাহ- ৯৯৭; সনদ সহীহ।

[৪৪] সহীহ বুখারী হা : ৪৪৫; সহীহ মুসলিম হা : ৬৪৯।

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম রোগীকে দেখতে যায়, তার সাথে ৭০,০০০ ফেরেশতা বের হয় এবং তারা তার জন্য দু'আ করেন।"[৪৫]

ফযীলত ও শিক্ষা :

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন।

অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা এবং দেখতে যাওয়া নেকিপূর্ণ কাজ।

অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে না পারলেও অন্ততপক্ষে দেখতে যাওয়া উচিত।

আমাদের করণীয় :

✔ অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের খোঁজ নেওয়া।

✔ অসুস্থদের জন্য দু'আ করা ও সান্ত্বনা দেওয়া।

৪. আল্লাহর রাস্তায় দানকারী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ فِيهِ العِبَادُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসেন। এক ফেরেশতা বলে, "হে আল্লাহ! দানকারীকে আরো দান দাও।' আর অন্য ফেরেশতা বলে, "হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির ধ্বংস ঘটাও।"[৪৬]

ফযীলত ও শিক্ষা :

আল্লাহর রাস্তায় দান করা ফেরেশতাদের দু'আ পাওয়ার একটি মাধ্যম।

দান করলে কখনো সম্পদ কমে না, বরং আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহর রাস্তায় দান না করলে সম্পত্তি হ্রাস পায় এবং ফেরেশতাদের বদ দু'আ পাওয়া যায়।

আমাদের করণীয় :

✔ সামর্থ্যানুযায়ী বেশি বেশি আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেষ্টা করা।

✔ কৃপণতা বর্জন করে ফেরেশতাদের দু'আ ও আল্লাহর রহমতের আশা করা।

৫. গোপনে অন্যের জন্য দু'আকারী ব্যক্তি।

রাসূল ﷺ বলেন,

مَن دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، قَالَ المَلَكُ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِهُ

"যখন কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দু'আ করে, তখন ফেরেশতা বলে : 'আমিন! এবং তোমার জন্যও একই দু'আ।" [৪৭]

ফযীলত ও শিক্ষা :

মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দু'আ করলে, ফেরেশতারাও তাঁর জন্য দু'আ করেন।

প্রকাশ্যে বা জনসম্মুখে দু'আ করার চেয়ে গোপনে দু'আ করা বেশি উপকারী।

আমাদের করণীয় :

✔ গোপনে মুসলিম ভাইদের জন্য দু'আ করা।

✔ সর্বদা পার্শ্ববর্তী মুসলিম ভাইয়ের সাথে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করা।

৬. মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তি। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

"আল্লাহ ও ফেরেশতারা সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করেন, যে মানুষকে ভালো কিছু শেখায়।"[৪৮]

ফযীলত ও শিক্ষা :

শিক্ষা দেওয়া একটি পুণ্যের কাজ, মহান পেশাও বটে। আল্লাহ তা'আলাও এ কাজকে পছন্দ করেন।

যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়, তাঁর ওপর আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতাগণের দু'আ থাকে।

---

[৪৫] তিরমিযী হা : ৯৬৯; সনদ হাসান।
[৪৬] সহীহ বুখারী হা : ১৪৪২; সহীহ মুসলিম হা : ১০১০।
[৪৭] সহীহ মুসলিম-২৭৩২।
[৪৮] তিরমিযী হা : ২৬৮৫; সনদ সহীহ।

আমাদের করণীয় :

✔ মানুষকে সৎ কাজ শেখানো ও উৎসাহিত করা।

✔ উপকারী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা, যাতে স্বদকায়ে জারিয়া হিসেবে অবশিষ্ট থাকে।

৭. অযু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ليس من عبدٍ يبيت طاهرًا إلا بات معه ملَكٌ، لا ينقلب ساعةً من الليلِ إلا قال:اللهم اغفِرْ له.

"যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করে, তার সঙ্গে ফেরেশতা থাকে এবং তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে।"[৪৯]

ফযীলত ও শিক্ষা :

পবিত্র থাকা এবং পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করা খুবই পুণ্যের কাজ।

পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করলে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ফেরেশতারা সঙ্গে থাকেন।

রাত্রি যাপনে পবিত্র হওয়া আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দু'আ পাওয়ার মাধ্যম।

আমাদের করণীয় :

✔ রাতে ঘুমানোর আগে অযূ করে পবিত্র হওয়া।

✔ ঘুমানোর পূর্বে দু'আ, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা।

৮. সাহরী গ্রহণকারী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতারা সাহারী ভক্ষণকারীদের জন্য দু'আ করেন।"[৫০]

ফযীলত ও শিক্ষা :

সিয়াম পালনকারীদের সাহারী খাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সাহারী খাওয়ার মধ্যে অনেক বরকত নিহিত রয়েছে।

সাহারী খাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দু'আ লাভ করা যায়।

আমাদের করণীয় :

✔ সাহারী খেয়ে সিয়াম পালনের চেষ্টা করা।

✔ ইচ্ছাকৃতভাবে সাহারী বর্জন না করা।

উপসংহার :

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু। ফেরেশতারা যখন আমাদের জন্য দু'আ করে, তখন তা আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। যার মাধ্যমে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরো উন্নত এবং পবিত্র করতে পারি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ করতে পারি।

আমাদের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ শুধুমাত্র একটি সম্মান নয়, বরং এটি একটি মহা-সুযোগ যেন আমরা আল্লাহর কাছ থেকে আরো বেশি রহমত ও ক্ষমা লাভ করতে পারি। সুতরাং, আমাদের উচিত নিজেদের কর্ম ও আচরণ এমনভাবে তৈরি করা, যাতে ফেরেশতারা আমাদের জন্য দু'আ করেন এবং আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাওফীক দিন, আমীন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন :

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।"

(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)

[৪৯] সহীহ আত তারগীব-৫৯৯; সনদ হাসান।
[৫০] ইবনে হিব্বান-৩৪৬৭; সিলসিলা সহীহা-২৪০৯।

নারীদের সিয়াম

সাইদুর রহমান*

কিছু নারী রামাযানের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। কিভাবে এই মহিমান্বিত মাসটির যথাযথ কদর করা যায় এই চিন্তায় কয়েক মাস আগ থেকেই বিভোর থাকে। হ্যাঁ, ওই সকল প্রিয় বোনের জন্যই আজকের এই লেখাটা। নবী ﷺ বলেন, النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ "নারীরা তো পুরুষের অনুগামী (বিধানের ক্ষেত্রে)।"[৫১]

পুরুষরা যেমন তাদের উপর ধার্যকৃত সিয়াম পালন করতে বাধ্য, অনুরূপ নারীরাও। কিন্তু নারীদের কিছু শারীরিক সমস্যার কারণে পুরুষদের ন্যায় গোটা মাস একাধারে সিয়াম রাখতে পারে না। অবশ্যই এতে নারীদের কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহই এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'হে মুমিনরা! তোমাদের পূর্বের জাতিদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।'[৫২]

এই আয়াতের পর্যায়ভুক্ত নারী-পুরুষ সকলেই। নারীরা যখন সুস্থ থাকবে অর্থাৎ তাদের পিরিয়ডের সময় থাকবে না, তখন পুরুষদের মতো সিয়াম রাখবে। নারী-পুরুষের সিয়ামের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। সব ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান।

রামাযানের দিনে বেলা পুরুষরা যেমন অশ্লীলতা, পাপাচার, অহেতুক কথাবার্তা, কাজ, গান, বাজনা থেকে দূরে থাকবে অনুরূপ নারীরাও। তবে একটা কথা বড্ড তিক্ত মনে হলেও সত্য, রমজানের দিনে আসরের সালাতের আগ পর্যন্ত মোটামুটি সকল নারী অবসর থাকেন। ইফতারের জন্য ব্যস্ততা শুরু হয় আসরের পর থেকে। আসরের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টাতে কিছু নারী গীবত পরনিন্দার পসরা সাজিয়ে থাকে। প্রিয় বোন, দেখুন আপনার সম্পর্কে আপনার নবী ﷺ কী বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[৫৩]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতদিন আপনি এই হাদিসটা জানতেন না বিধায় অপলাপ পরনিন্দায় মগ্ন ছিলেন। তাহলে আজ থেকে এসব আর করবেন না।

পিরিয়ডের সময় নারীরা সিয়াম রাখবে না। রমজান শেষ হলে সারা বছরের মাঝে যেকোনো সময় রাখতে পারবে। তবে আমরা মনে করি, যত তাড়াতাড়ি করা যায়, তত তাড়াতাড়ি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। তাই উচিত যত দ্রুত করা যায়।

আয়েশা رضي الله عنها-কে পিরিয়ডের সময় সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

(আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে ঋতুবতী হলে) তিনি আমাদের সিয়াম কাযার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সালাত কাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন না।'[৫৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কথাটা বলতে ইতস্তত লাগলেও বলতে হবে। কারণ সত্য উন্মোচনে স্বয়ং আল্লাহও লজ্জাবোধ করেন না।

إن اللهَ لا يَسْتَحِي من الحقِّ 'নিশ্চয় আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না।'[৫৫]

অনেক নারীর সাথে তার স্বামী রামাযানের দিনের বেলায় একটু আনন্দ উল্লাস করতে চায়। বুঝতেই তো পারছেন আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি। এক্ষেত্রে কথা হলো সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যাবে।

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৫১] আবু দাউদ হা : ২৩৬।
[৫২] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৩।
[৫৩] সহীহ বুখারী হা : ১৯০৩।
[৫৪] আবু দাউদ হা : ২৬৩।
[৫৫] ইরওয়া উল কালীল, হা/২০০৫।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

'সিয়াম অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়েশা(রা) হেসে দিলেন।'[৫৬]

এ হাদীসে কিন্তু যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি । কিছু বিদ্বান পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, বৃদ্ধ হলে স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে ও জড়িয়ে ধরতে পারবে। কিন্তু যুবক হলে পারবে না। অবশ্য এর পেছনে কোনো দলিল নেই।

এখন কথা হলো কারো যদি চুমু দেয়ার কারণে বা জড়িয়ে ধরার কারণে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে । আবার এই সিয়ামটা পরে করতে হবে। আমাদের অনেকের ধারণা ৬০টি সিয়াম করতে হবে। আদতে বিষয়টা এমন নয়। স্ত্রী সহবাস করে কেউ সিয়াম ভঙ্গ করলে এই হুকুম তার জন্য বর্তাবে। অর্থাৎ ৬০টি সিয়াম রাখতে হবে।

রামাযানে কোনো নারীর বাচ্চা হলে সে সুস্থ হলে অবশিষ্ট সিয়ামগুলো রাখবে। আর যে সিয়ামগুলো রাখতে পারেনি রামযানের পরে তা রেখে দিবে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর যদি সিয়াম রাখতে সমস্যা না হয় তাহলে রামাযান মাসে সিয়াম রাখবে। আর যদি সমস্যা হয় তাহলে রামাযানের পরে যে কোনো মাসে সিয়াম রেখে নিবে। পরবর্তীতে যদি সিয়াম রাখতে অপারগ হয়ে যায় তাহলে ফিদিয়া দিবে। অর্থাৎ অর্ধসা করে ৩০ জন মিসকিনকে চাউল দান করবে বা ৬০ জন মিসকীনকে খাইয়ে দিবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

'আর যারা সিয়াম পালনে অপারগ তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে।'[৫৭]

অসুস্থ নারী কীভাবে সিয়াম রাখবে?

অসুস্থ নারী যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রামাযানের পর সিয়াম রাখবে। আর যদি সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ফিদিয়া দিবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

'আর যারা সিয়াম পালনে অপারগ তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে।' [৫৮]

কোনো নারী যদি রামাযানে সফর করে। আর সফর করে সিয়াম রাখতে যদি তার কষ্ট না হয় তাহলে সিয়াম রাখাই উত্তম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

'আর সিয়াম রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'[৫৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ رَوَاحَةَ.

আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইবনে রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত আমাদের কেউই সিয়ামরত ছিলেন না।[৬০]

আর যদি কষ্ট হয় তাহলে সিয়াম না রাখাই উত্তম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

'আর যে অসুস্থ বা সফরে রয়েছে, সে অন্য কোনো সময় সিয়াম রাখবে।'[৬১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

[৫৬] সহীহ বুখারী হা : ১৯২৮।
[৫৭] সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৪।
[৫৮] সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৪।
[৫৯] সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৪।
[৬০] সহীহ বুখারী হা : ১৯৪৫।
[৬১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কী হয়েছে?' লোকেরা বললো, সে সিয়াম রেখেছে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'সফরে সিয়াম পালনে কোনো সওয়াব নেই।'[৬২]

কোনো নারী যদি সিয়াম বাকী রেখে মারা যায় তাহলে তার পরিবার পক্ষ থেকে তার সিয়াম রাখবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

'কেউ সিয়াম বাকী রেখে মারা গেলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সিয়াম আদায় করবে।[৬৩]

আর কেউ যদি সিয়াম রাখতে না পারে তাহলে ফিদিয়া দিয়ে দিবে।

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক মাসের সিয়াম না রেখে মৃত্যুবরণ করে তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।[৬৪]

হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও এর ওপর ফতোয়া রয়েছে।

রামাযান মাসে নখ কাটা, বগলের নিচের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নিচের পশম কাটলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনেক নারী মনে করে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যার কারণে তারা রাতে এগুলো কাটে।

নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই সাজসজ্জা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ইসলাম একে সাপোর্ট করেছে। রামাযানে দিনের বেলা নারীরা বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে। যেমন মেহেদী দেয়া, স্নো, পাউডার, চোখে সুরমা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে ইতিকাফ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরাও ইতিকাফ করেছেন। তাই নারীরা যদি ইতিকাফ করতে চায় তাহলে করতে পারবে। তবে অবশ্যই জামে মসজিদে ইতিকাফ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

'মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তোমরা তাদের সাথে সহবাস করবে না।'[৬৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইতিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ .

ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, সওম না রেখে ইতিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ইতিকাফ করবে।[৬৬]

অনেক নারীকে দেখা যায় ইতিকাফ করার মানসে রামাযানের শেষ দশকে ঘরের এক কোণে নির্জন স্থানে ইতিকাফে বসে যায়। তাদের এই ইতিকাফ হবে না। কারণ ইতিকাফ করার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজিদ।

নারী যদি ইতিকাফ করে তাহলে তার স্বামী তার সাথে দেখা করতে যেতে পারবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রী সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ " . قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا " .

[৬২] সহীহ বুখারী, হা : ১৯৪৬।
[৬৩] সহীহ বুখারী, হা : ১৯৫২।
[৬৪] ইবনু মাজাহ, দুর্বল সনদ, হা : ১৭৫৭।
[৬৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭।
[৬৬] আবু দাউদ, হা : ২৪৭৩।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর নিকট গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (সাফিয়া رضي الله عنها বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনু যায়িদ رضي الله عنه -এর ঘর (সংলগ্ন)। এ সময় আনসার গোত্রের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,'তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতু হুয়াই।' তারা দুজনে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু'জনের মনে মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে।

এই হাদীসে যদিও স্ত্রীর মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু স্বামীও এই হুকুমের আওতাধীন রয়েছে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত রয়েছে নারীদের ক্ষেত্রেও হুবহু একই শর্ত। অর্থাৎ সহবাস করা যাবে না, প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না, অনর্থক কথাবার্তা বলবে না।

অনেক নারীকে দেখা যায়, ইতিকাফে বসে অপর নারীর সাথে বাড়ির যত্তসব কথাবার্তা আছে সবকিছু শেয়ার করে। এগুলো বলা যাবে না। কিছু নারী তো আগ বাড়িয়ে মসজিদে গীবত পরনিন্দা শুরু করে। এগুলো করলে ইতিকাফের যে হেতু আছে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ঝুড়ি কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে হবে।

ইতিকাফ করা অবস্থায় কোনো নারীর যদি পিরিয়ড শুরু হয় তাহলে ইতিকাফ ভঙ্গ করে মসজিদ ত্যাগ করবে। ওই অবস্থায় মসজিদে কোনো অবস্থাতেই অবস্থান করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের (মসজিদের) নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না যা বলছো, তা বুঝতে পারবে এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করার আগ পর্যন্ত, তবে মুসাফির হলে ভিন্ন কথা।"[৬৭]

[৬৭] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৪৩।

নবী ﷺ বলেছেন,

فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ .

'ঋতুবতী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মাসজিদে অবস্থান আমি বৈধ মনে করি না।'[৬৮]

রামাযানের পর ইচ্ছে করলে ওই ইতিকাফের কাযা আদায় করতে পারবে। তবে করাটা আবশ্যক নয়; বরং মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ " مَا هَذَا ". قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ ". فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে আয়েশা (রা) তাঁর কাছে ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফসা رضي الله عنها আয়িশা رضي الله عنها-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনতু জাহশ رضي الله عنها নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হল। আয়িশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'এ কী ব্যাপার?' লাকেরা বলল, আয়েশা, হাফসা , যায়নাব رضي الله عنها- এর তাঁবু। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ইতিকাফ করবো না।'এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে সাওম শেষ করে শাওয়াল মাসের দশ দিন ইতিকাফ করেন।[৬৯]

আল্লাহ তাআলা প্রিয় বোনদের সুস্থতার সাথে রামাযানগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন আমীন।

[৬৮] আবু দাউদ, দুর্বল হাদীস, হা : ২৩২।
[৬৯] সহীহ বুখারী হা : ২০৪৫।

শুব্বান পাতা | صفحات الشبان

যেমন ছিল সালাফদের রামাযান

মোহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম *

ভূমিকা :

রামাযান মাস কল্যাণের মাস। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত যাবতীয় কল্যাণের সমাহার নিয়ে বছর ঘুরে আমাদের সামনে রামাযান উপস্থিত হয়। রহমত, বরকত আর মাগফিরাতের সামষ্টিক রূপ রামাযান। সত্যিকার অর্থে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত যে এই মহান মাস পেল অথচ সিয়াম রাখতে পারল না। এই সুবর্ণ বর্ণাঢ্য আয়োজনে যেখানে ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত একাকার হয়। যেই ইবাদতের একেকটি মহা-মূল্যবান, ফলাফল কাঙ্ক্ষিত জান্নাত। সিয়াম এমন একটি ইবাদত যেই ইবাদতের সওয়াব অপরিসীম ও পুরস্কারও মহান রবের হাত থেকে পাওয়া যায়। সুবহান আল্লাহ। কতই না সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তির জীবন, যে এমন প্রভূত কল্যাণের মালিক হতে পারে। তাই তো আমরা দেখি সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালিহীন রামাযানের সিয়ামকে পাওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই দু'আ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ব্যবসা বাণিজ্য, দারস-তাদরীস, দায়বদ্ধতা ও সফর ছাড়াও সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। মূলত বক্ষমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল- উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের রামাযানের সিয়াম সাধনা, পরিশ্রম, লৌকিকতাহীন ইবাদত করে সিয়ামের যথার্থ হক আদায় করে উভয় জীবনে সফলতার পথে চলা। তাই আমরাও তাঁদের মত আলোকজ্জ্বল অনুপ্রেরণার জীবন গড়তে তাঁদের ইবাদতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জান্নাত কামনা করতে চাই।

* শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামীক একাডেমী, ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর জেলা।

যেভাবে সালাফগণ রামাযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন :

সালাফগণ রামাযান আসার পূর্বে নানা রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রামাযানকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন, রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পাবন্দি হওয়ার জন্য তারা সদা উদগ্রীব ছিলেন। রামাযানের এই ইবাদতের মৌসুম উপলক্ষে তাঁদের চেহারায় আনন্দের ছাপ ভাসত। সদা হাস্যোজ্জ্বল, পরিস্ফুটিত চেহারা জ্বলজ্বল করত। তাঁদের রামাযানের প্রস্তুতি হত দু'আ করার মাধ্যমে। কেননা রামাযান মাসে যাবতীয় কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়। যে মাস কুরআনের মাস। সে কারণে তাঁরা আনন্দিত হতো। আনন্দ, খুশির বহিঃপ্রকাশ করত। তাঁরা রামাযানের আগমনে যাবতীয় দায়বদ্ধতা, কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকার প্রস্তুতি নিত। উদ্দেশ্য যেন রামাযান মাসের ইবাদত হাতছাড়া না হয়। যথাযথভাবে প্রত্যেক সময়কে মূল্যায়ন করতে তাঁরা বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন, কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত যে, 'তাঁরা আল্লাহর কাছে ৬ মাস দু'আ করতেন এই মর্মে যে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের রামাযানে পৌঁছান (তথা তাঁরা সিয়াম রাখতে পারেন)। অতঃপর রামাযান পরবর্তী ৫ মাস তাঁরা দু'আ করতেন আল্লাহর কাছে যেন তাদের সিয়াম আল্লাহ কবুল করেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তাদের রামাযানে উপনীত করে দ্বীন ও শারীরিক কল্যাণের ওপর এবং তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন যেন তিনি তাঁদেরকে তাঁর আনুগত্যের ওপর সাহায্য করেন। তাঁরা দু'আ করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা আমলসমূহ কবুল করেন'।[৭০]

রামাযানের সিয়ামের সাথে অন্যান্য ইবাদত পালনে কোনরকম ঘাটতির সম্ভাবনা এড়াতে সালাফগণ শা'বান মাসে বেশি করে সিয়াম রাখার অনুশীলন করতেন।

রামাযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এজন্য বলা হয় রামাযান কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াত, উপলব্ধি, অনুধাবন এবং তাঁর বাস্তব চিত্র জীবনে ধারণ করার সুবর্ণ

[৭০] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ১৪৮।

সুযোগ হল রামাযান মাস। এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সালাফগণ শা'বান মাসেই কুরআন তেলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করতেন। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মুসলিমদের কাছে যখন শা'বান মাস উপস্থিত হয়, তখন তাঁরা কুরআনের মুসহাফের ওপর উপুড় হয়ে পড়ত'।[৭১]

সালামাহ ইবনে কুহাইল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, 'শা'বান মাসকে তেলাওয়াতকারীদের মাস বলা হত। ক্বারীদের মাস'। শা'বান মাস শুরু হলে আমর ইবনে কায়েস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর দোকান বন্ধ রাখতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অবসর নিতেন। আবূ বকর আল-বালখী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, 'রজব মাস হল- বীজ বপনের মাস। শা'বান মাস হল- ক্ষেতে সেচ প্রদানের মাস এবং রামাযান মাস হল- ফসল তোলার মাস'। তিনি আরো বলেছেন, 'রজব মাসের উদাহরণ হল- বাতাসের ন্যায়, শা'বান মাসের উদাহরণ হল- মেঘের ন্যায়, রামাযান মাসের উদাহরণ হল- বৃষ্টির ন্যায়। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করল না, শা'বান মাসে সেচ প্রদান করল না, সে কিভাবে রামাযান মাসে ফসল চাইতে পারে?'[৭২]

ঈমাম মালেক ইবনু আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন রমাযান মাস প্রবেশ করত তখন তিনি হাদীছের দারস থেকে সরে যেতেন। অতঃপর তেলাওয়াতের জন্য শুধু কুরআন গ্রহণ করতেন।[৭৩]

সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন রমাযান মাস আগমন করত তখন তিনি যাবতীয় ইবাদত পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন গ্রহণ করতেন।[৭৪]

যেমন ছিল সালাফদের রামাযানের দিনরাত : রামাযানের সিয়াম মানেই হল আত্মসংযম, যাবতীয় অন্যায়, অশালীন, মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা। গীবত, তোহমত, সূদ, ঘুষ, মিথ্যাচার ছাড়াও সকল প্রকারের পাপ থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম। যেহেতু সিয়াম মানুষকে বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ সকল প্রকারের পাপের পথকে নিষেধ করে তাই একজন সিয়ামপালনকারীর জীবন হয় পরিমার্জিত, সুসজ্জিত ও সুগঠিত। পাপের কোনো প্রকার গন্ধ তাঁর শরীরে পাওয়া যাবে না বলেই সিয়াম নিয়ে আসে বড় আত্মসংযমী শিক্ষা। সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন সালাফগণ রামাযানের সিয়াম থাকা অবস্থায় কিভাবে দিনাতিপাত করতেন। তাদের চিত্র আর আমাদের জীবনযাত্রার চলমান চিত্রকে তুলনা করুন। দেখুন আমাদের কত করুণ অবস্থা!

সালাফগণ রামাযান মাসে খেতেন হিসাব করে। কম খেতেন, কম ঘুমাতেন, কম কথা বলতেন, ঘোরাফেরা খুব কমই করতেন। সব সময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁরা ইবাদত বিমুখ চিন্তা-চেতনায় মশগুল থাকা থেকে যথাযথ বিরত থাকতেন। তাঁরা পরস্পর সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করতেন। প্রত্যেক সময়ের মূল্যায়ন করতেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সময় নষ্ট মৃত্যুর চেয়েও বেশি কঠিন। কেননা সময় নষ্ট আল্লাহ ও পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর মৃত্যু তোমাকে দুনিয়া ও তোমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে'।[৭৫]

সিয়াম শুধুই ভুখা থেকে দিনযাপনের নাম নয়। বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এক ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচির নাম। সিয়াম যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে যা আল্লাহর আবশ্যকীয় হক, ঠিক তেমনি সিয়াম আরো শিক্ষা দেয় সিয়াম থাকা অবস্থায় কিভাবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জিহ্বাকে হেফাযত করা যায়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'যখন তুমি সিয়াম রাখবে তখন তুমি তোমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির সিয়াম রাখো। তোমার জিহ্বাকে যাবতীয় মিথ্যাচার ও হারাম থেকে বিরত থাকার সিয়াম রাখো এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। তোমার ওপর আবশ্যক হল সিয়াম থাকা অবস্থায় নম্র, বিনয়ী ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। খবরদার! সিয়ামের দিন আর অন্য দিনসমূহকে এক ই মনে করিও না'।[৭৬]

সালাফগণ রামাযানে সিয়াম থাকা অবস্থায় গীবত, মিথ্যাচার, মূর্খতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতেন, যাতে করে সিয়ামের ওপর প্রভাব না পড়ে। ইবনুল মুনকাদির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যখন

[৭১] প্রাগুক্ত।
[৭২] ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, ফৎওয়া নং-৯২৭৪৮।
[৭৩] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বলী, পৃ. ৩১৮।
[৭৪] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বলী।
[৭৫] ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, আল ফাওয়ায়েদ।
[৭৬] মুছান্নাফু ইবনি আবী শায়বাহ, হা : ৮৮৫২।

গীবত করে তখন সে সিয়ামকে ছিদ্র করে। আর যখন ইস্তিগফার করে তখন তাতে জোড়াতালি লাগে।[৭৭] তাঁরা সিয়াম থাকা অবস্থায় সালাত, সিয়ামের পাশাপাশি দান-সাদাক্বাহ, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ও মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

সিয়ামকে 'ঢালস্বরূপ' বলা হয় কেন?

যুদ্ধের মাঠে যেমন বিরোধী দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা ও পরাজিত করার জন্য, ঠিক এমন সংকটময় যুদ্ধ ময়দানে প্রতিপক্ষের তরবারী, তীর ও অস্ত্রশস্ত্র থেকে নিজেকে সুরক্ষা ও হেফাজত রাখার জন্য সেনাবাহিনীরা যে বস্তু ব্যবহার করে তাকে ঢাল বলে। সিয়ামকে 'ঢাল' বলা হয়েছে এজন্য যে, 'ঢাল যেমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে আঘাত ও তীরসহ যাবতীয় অস্ত্র থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সিয়াম বান্দাকে তার দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে। মনে রাখবেন! যদি সিয়াম দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য 'ঢালস্বরূপ' হয়, তাহলে সেই সিয়াম তার জন্য পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য 'ঢাল' হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার জীবনে সিয়াম যাবতীয় পাপাচার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার জন্য 'ঢাল' হিসাব কাজ না করে, তাহলে পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না। এজন্য সিয়ামকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৭৮]

সালাফদের ক্বিয়ামুল লাইল :

সালাফগণ ক্বিয়ামুল লাইল নিয়মিত পালন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন,

১. ইবনু মুনকাদির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোন স্থায়ী স্বাদ নেই। যথা : ১- ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ), ২- মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং ৩- জামা'আতের সাথে সালাত আদায়'।

২. আবূ সুলাইমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে ইবাদতগুজার ব্যক্তির রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ ও মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত, তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকত না'।

৩. জনৈক সালাফ বলেন, 'যদি রাজা-বাদশাহরা জানত যে, আমরা রাতে কী নে'আমত পাই, তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত'।

৪. আলী ইবনু বকর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'চল্লিশ বছর সূর্য উদয় ছাড়া আমাকে অন্য কিছু চিন্তাগ্রস্ত করেনি'।

৫. ফুযাইল ইবনু ই'আয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই এজন্য যে, রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে আমার রবের সান্নিধ্যে একাকীত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তাগ্রস্ত হই'।[৭৯]

সালাফদের ঈদ উদযাপন :

ঈদ মানে আনন্দ। কিন্তু সালাফদের ঈদের আনন্দ ছিল ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন রকমের। যেমন,

১. ইবনু রজব হাম্বালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয়, যে নতুন পোশাক পরিধান করে; বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তার প্রভুর আনুগত্য বৃদ্ধি করে। ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাকের সাজসজ্জা ও গাড়ি বহর প্রদর্শন করে; বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার পাপকে মোচন করা হয়েছে'।[৮০]

২. একদিন এক ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিন আমীরুল মুমিনীন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁর কাছে একটি শুকনো রুটি দেখতে পান। লোকটি শুকনো রুটি দেখে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আজকে ঈদের দিন অথচ শক্ত শুকনো রুটি! আলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁকে বলেন, 'আজকে ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার সিয়াম, ক্বিয়াম কবুল করা হয়েছে। ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং আমলকে কবুল করা হয়েছে। আজকে আমাদের জন্য ঈদ, আগামীকালও আমাদের জন্য ঈদ। প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেই দিন আমাদের ঈদ'।[৮১]

---

[৭৭] দ্র. : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম লিইবনে রজব হাম্বলী।
[৭৮] দ্র. : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম লিইবনে রজব হাম্বলী।
[৭৯] দ্র. : ড. মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম সুলাইমান, ক্বিয়ামুল লাইল।
[৮০] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ২২৭।
[৮১] মাওকেয়ুল মিম্বার থেকে গৃহীত, খুতবার বিষয় : ঈদুল আযহা আল-মুবারক।

৩. সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কতিপয় সাথী বলেন, 'আমি ঈদের দিন তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমরা এই দিন সর্বপ্রথম শুরু করব চোখ নিম্নগামী করার মাধ্যমে'।[৮২]

৪. কতিপয় সালাফের মুখে হতাশা, দুশ্চিন্তার ছাপ প্রকাশ পায় ঈদের দিনে। ঈদের দিন আনন্দ ও খুশির বদলে এমন মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করা হল: আজকের দিন হল খুশির ও আনন্দের। অতঃপর তিনি প্রতিত্তোরে বলেন, তোমরা সত্য বলেছ। কিন্তু আমি এমন একজন বান্দা যে, আমার রব আমাকে আদেশ করেছে তাঁর জন্য এমন আমল করার অথচ আমি জানি না যে, সে আমল আমি করতে পেরেছি কিনা!'[৮৩]

৫. হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'প্রত্যেক এমন দিন যে দিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না সেটাই হল ঈদ'।[৮৪]

রামাযান ও রামাযান পরবর্তী সালাফদের কুরআন খতম :

ইমাম ইবনু রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোন কোন সালাফ রামাযানের ক্বিয়ামুল লাইলে তিন রাত্রে কুরআন খতম করতেন। ক্বাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রত্যেক সাত রাত্রে কুরআন খতম করতেন। আবূ রাজা আত্তারিদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রত্যেক দশ রাত্রে কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ রামাযানের সালাত ও সালাত ছাড়া কুরআন খতম করতেন। আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রামাযানের প্রত্যেক দুই রাতে খতম করতেন। বিশেষ করে ইমাম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রামাযানের শেষ দশকে কুরআন খতম করতেন। আর মাসের অন্যান্য সময়ে তিন রাতে খতম করতেন।[৮৫]

ইমাম যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রামাযান মাস উপস্থিত হলে বলতেন, নিশ্চয় এ মাস কুরআন তেলাওয়াত ও খাবার খাওয়ানোর মাস।[৮৬]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুকসিম ইবনু সাঈদ বলেছেন, রামাযান মাসে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট রাতের প্রথম ভাগে তার সাথীবৃন্দ সময়েত হত। তিনি তাদরেকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। প্রতি রাক'আতে বিশ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। এভাবেই তিনি কুরআন খতম করতেন। আর সাহারীর সময় অর্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন। আর প্রতি দিন ইফতারের সময় তার খতম সম্পন্ন হত।[৮৭]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রামাযানের প্রথম অংশে মুসহাফ নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর সূর্য উদয় হওয়ার পর ঘুমাতেন।[৮৮]

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সালাফদের কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াতে মনোযোগী হওয়া এবং বেশি বেশি তেলাওয়াত করা আবশ্যক। সালাফগণ তাদের সাধ্যানুযায়ী খতম করতেন। এটা তাঁদের নিয়মিত অভ্যাস ছিল'।[৮৯]

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ দু'মাসে একবার কুরআন খতম দিতেন। আর কেউ কেউ এক মাসে একবার কুরআন খতম দিতেন। কেউ কেউ ১০ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। কেউ কেউ ৮ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ৭ দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন। কেউ কেউ ৬ দিনে দিতেন। কেউ পাঁচ দিনে, কেউ চার দিনে। কেউ তিন দিনে, কেউ দুই দিনে আবার কেউ দিনে রাতে একবার কুরআন খতম দিতেন। কেউ কেউ দিনে একবার রাতে একবার কুরআন খতম দিতেন। কেউ দিনে তিন বার আবার কেউ দিনে চারবার রাতে চারবার মোট আটবার কুরআন খতম দিতেন।[৯০] যারা দিনে ও রাতে একবার কুরআন খতম দিতেন তারা হল- উসমান ইবন আফ্ফান, তামীম দারী, সাঈদ বিন জুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। আর যারা তিনবার খতম দিতেন তারা হলেন সুলাইম বিন ঈতর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবু বকর বিন আবু দাউদ। তাদের মধ্যে যারা রাতেই চারবার খতম দিতেন তিনি হলেন আবূ ওমর আল-কিন্দি। আর যারা দিনে রাতে

[৮২] ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, আত্ব-তাবছীরাহ, পৃ. ১০৬।
[৮৩] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ২০৯।
[৮৪] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ২৭৮।
[৮৫] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ৩১৮।
[৮৬] প্রাগুক্ত।
[৮৭] হাদিউস সারী ইবনু হাজার আসক্বালানী, পৃ. ৪৮১।
[৮৮] প্রাগুক্ত।
[৮৯] আত-তিবইয়ান ফী আদাবিল হামালাতিল কুরআন, পৃ. ৪৬।
[৯০] প্রাগুক্ত।

মোট আটবার কুরআন খতম দিতেন তিনি হলেন উসমান আল-মাগরীবী।[৯১]

সুধী পাঠক! যদিও তিন দিন ও তিন রাতের কম সময়ে কুরআন খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

"যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করল সে তার মর্ম বুঝবে না'।[৯২] তবে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করাকে কেবল সর্বদা পাঠ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞারোপ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ সময় যেমন রামাযান মাস ইত্যাদি সময়ে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব'।[৯৩]

শায়খ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'মুমিন-মুমিনার জন্য শরী'আতসম্মত হল- ফায়দা অর্জন, ইলম হাসিল, অন্তরের একাগ্রতা এবং কালামুল্লাহ থেকে উপকার লাভের আশা করা। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনা, তা'আক্বুল তথা বুঝতে পারা এবং বেশি বেশি আমল করা; শুধু খতমের আশায় তেলাওয়াত না করা। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কালামুল্লাহ থেকে উপকার এবং অন্তরের একাগ্রতা ও বিনম্রতা অর্জন করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা এবং যা তেলাওয়াত করা হয় তা অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তর নরম করা। আর যদি কেউ কুরআন স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করে এবং তিনদিনে খতম করে অথবা পাঁচদিনে বা সাতদিনে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হল, তিনদিনের কম সময়ে খতম না করা। তাই প্রত্যেক দিন দশপারা তেলাওয়াত করা, যাতে করে তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা যায়, যাতে তা'আক্বুল তথা পুরোপুরি বুঝতে পারা যায় ও তাড়াতাড়ি না হয়। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাওফীক দান করুন'।[৯৪]

[৯১] প্রাগুক্ত।

[৯২] আবূ দাউদ, হা : ১৩৯৪; তিরমিযী, হা : ২৯৪৯; ইবনু মাজাহ, হা : ১৩৪৭; মিশকাত, হা : ২২০১, সনদ ছহীহ।

[৯৩] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ৩১৮।

[৯৪] শারহু সামাহাতিশ শায়খ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায আলা কিতাবি ওয়াযাইফু রামাযান আবদির রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম, পৃ. ১৪০।

রামাযানের শেষে সালাফদের অবস্থা :

রামাযানের শেষে সালাফদের চেহারা বিষণ্ন ও বিবর্ণ হয়ে যেত। ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা রামাযানের প্রাপ্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দীর্ঘ সাধনা কবুল করেন। যেমন,

১. বাশার আল-হাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এমন গোত্র আছে যারা রামাযানে ইবাদতগুজার ও আমলের ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করে। অতঃপর রামাযান শেষ হলে তা পরিত্যাগ করে। তিনি একথা শুনে বলেন, ঐ ক্বওম কতই না নিকৃষ্ট, যারা রামাযান ছাড়া আল্লাহকে চিনে না।[৯৫]

২. খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একবার ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন। অতঃপর তিনি খুতবায় বললেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর জন্য ৩০ দিন সিয়াম রেখেছ, ৩০ দিন ক্বিয়াম করেছ। আর আজকে তোমরা বের হয়েছ আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য যে, যেন আল্লাহ তোমাদের থেকে রামাযানের সিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করেন'।[৯৬]

৩. ক্বাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'যাকে রামাযান মাসে ক্ষমা করা হয়নি, তাকে রামাযান ছাড়া অন্য কোন মাসে ক্ষমা করা হবে না'।[৯৭]

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই যে, সালাফরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের চলার পথকে শাণিত করে। তাদের ইবাদতগুজার, পরহেযগারিতা ও দুনিয়াবিমুখ জীবন আমাদেরকে আবার নতুন করে ভাবতে শেখায় যে, ইবাদত কিভাবে করতে হয়? যার ফলাফল উভয় জাহানের প্রভূত কল্যাণের মালিক হওয়া যায়। আল্লাহ আমাদেরকে সালাফে সালেহীনের পথকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং রামাযানকে তাঁদের মতো করে গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

[৯৫] মিফতাহুল আফকার লিলত্বায়াহুব লিদারিল ফেরার, ২য় খণ্ড, পৃ.২৮৩।

[৯৬] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ২০৯।

[৯৭] লাত্বায়িফুল মা'আরিফ লিইবনি রজব হাম্বালী, পৃ. ২১১।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ***সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ছাড়াও যে সকল ফর্‌য/ওয়াজিব 'ইবাদত ও কার্যাবলী আছে –তার একটি তালিকা দয়া করে জানাবেন কি?*** *রিয়াজুল ইসলাম*

উত্তর : সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জের পূর্বে মহান আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন আল-ইসলাম ও নাবী ﷺ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। যেসব বিষয় ইসলাম নষ্ট করে দেয়, তা বিস্তারিত জানা। যেমন- শির্ক, কুফ্‌র ইত্যাদি। বিশেষতঃ ইসলাম ও জাহিলিয়াত-এর মধ্যকার পার্থক্য, হালাল, হারাম, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর হাক্ব ইত্যাতি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজিব।[১]

প্রশ্ন (২) : ***নফল সিয়াম বা সালাত আদায় করলে তা না কি নিয়মিত আদায় করতে হয়। নফল সিয়াম ভাঙা জায়েয নয়? এ ফাতওয়া কি ঠিক? মেহেরবানীপূর্বক জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *(রিজওয়ান হামিদ)*

উত্তর : নফল সিয়াম প্রয়োজনে ছেড়ে দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। নফল সিয়াম অতিরিক্ত বিষয়; আবশ্যক নয়। তাই সিয়াম পালনকারী নিজে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সিয়াম পূর্ণ করবে কিংবা ছেড়ে দেবে। একদা রাসূল ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– খাবার কিছু আছে কি? তখন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها তাঁর ﷺ জন্য ছাতু পেশ করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন : আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছি। অতঃপর (সিয়াম ভেঙে) তা থেকে কিছু খেলেন।[২]

প্রশ্ন (৩) : ***আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও দেখা যায় ঈদের সালাত সর্বদা মাসজিদে আদায় করেন। আবার অধিকাংশ খোলা মাঠে আদায় করে থাকেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মূলতঃ কোন্‌টি ঠিক?***
রগীব এহসান, গোপালগঞ্জ

উত্তর: ঈদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত।[৩] আমরা সামান্য খেয়াল করলে দেখতে পাবো- মাসজিদে নাবাবীর মতো কেন্দ্রীয় মাসজিদ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নাবী ﷺ উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। শরঈ কারণ ছাড়া মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাতবিরোধী। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (৪) : ***সাদাক্বাতুল ফিত্‌র (ফিত্‌রা), যাকাত ও কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ের টাকা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সূরা ও আয়াত নংসহ সহীহ হাদীস মোতাবেক (হাদীস নং-সহ) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভাগ/বন্টনের নীতিমালা বিস্তারিত জানতে চাই।*** *(রাকিবুল হাসান)*

উত্তর : যাকাত বণ্টনের কথা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কুরআনে।[৪] যাকাতুল ফিতর মূলতঃ গরীব-মিসকিনদের হক।[৫] কুরবানী চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাও অনুরূপভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। ইসলামের বণ্টননীতি সকল যুগে ও প্রেক্ষাপটে সমভাবে প্রযোজ্য। 'ফী সাবীলিল্লাহ' ও 'দাসমুক্তি'র খাতদু'টিও যথারীতি বলবত থাকবে। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য যেসব খাত ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাতেও ব্যয় করা যাবে। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (৫) : ***আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যদি ই'তিকাফ করি, তাহলে কোনো প্রয়োজনে আমি আমার স্ত্রীর কোনো খিদমাত নিতে পারব কি? একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।*** *(আমজাদ হোসেন, বরিশাল)*

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি মাসজিদে থেকেই আপনার স্ত্রীর দ্বারা কোনো খিদমাত নিতে পারবেন। মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন : "ই'তিকাফ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর চুল পরিপাটি করে দিতাম।"[৬]

---

[১] সূরা মুহাম্মাদ আয়াত : ১৯, সূরা আল হুজরাত আয়াত : ১৫, ইবনু মাযাহ্- হা : ২২৪, সহীহ জামে' লিল আলবানী হা : ৩৮০৮।
[২] সহীহ মুসলিম হা : ১১৫৪।
[৩] সহীহ বুখারী হা : ৯৫৬ ও সহীহ মুসলিম হা : ৮৮৯
[৪] সূরা আত্ তাওবাহ্ আয়াত : ৬০।
[৫] সুনান আবূ দাউদ হা : ১৬০৯।
[৬] সহীহ বুখারী হা : ২০২৯ ও সহীহ মুসলিম হা : ২৯৭।

তবে অবশ্যই সর্বপ্রকার শাহাওয়াত বা প্রবৃত্তির চাহিদা হতে পবিত্র-মুক্ত থাকতে হবে।

☞ প্রশ্ন (৬) : ***যাকাতুল ফিত্‌র যাকে আমরা ফিতরা বলি, তা ফর্‌য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক কি না? আমাদের সমাজের 'আলিমগণ বলেন– ফিতরার জন্যও নিসাব প্রয়োজন। তা না হলে ফিতরা ফর্‌য হবে না। এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে সঠিক উত্তর পাব বলে একান্ত আশাবাদী।*** *(নূরুল আবসার, উত্তরা, ঢাকা)*

উত্তর : যাকাতুল ফিত্‌র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা ফর্‌য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি। তিনি ﷺ মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর যাকাতুল ফিত্‌র ফর্‌য করেছেন।[৭] এখানে নিসাবের কোনো কথা উল্লেখ নেই। কাজেই যারা নিসাবের কথা বলবে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারী'আতের উপর হস্তক্ষেপ করবে– যা সঠিক নয়।

☞ প্রশ্ন (৭) : ***যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নিয়ম কী? কোনো কারণবশতঃ ঈদের পর আদায় করলে চলবে কি? আমি একটি হাদীসে পড়েছি– ঈদের পর যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করলে না-কি সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হয়। আসলে একথার সত্যতা কতখানি? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। (আজমল হোসাইন, চাঁদপুর)***

উত্তর ঈদের দিন ফজরের পর হতে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতে হয়।[৮] ঈদের পর আদায় করা সুন্নাহবিরোধী। আর সুন্নাহবিরোধী কাজ কেউ করলে সে গুনাহগার হবে। তাই বলে আদায় না করে কোনো উপায় নেই। ফিতরা প্রদান করতে হবে এবং বিলম্বের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো ব্যক্তি ঈদের দু'এক দিন আগে তা আদায় করে দিতে পারে। সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ-এর 'আমল দ্বারা তা প্রমাণিত।[৯]

☞ প্রশ্ন (৮) : ***আমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে ই'তিকাফ করতে চাই। শুনেছি ২১ রামাযান ফজরের পর ই'তিকাফে বসতে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পর প্রবেশ করেত হয়। আসলে কোন্‌টি ঠিক? দলীলসহ উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন। (হামজা মোল্লা)***

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ ২০ রামাযানের সূর্যাস্তের সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ করতেন, অতঃপর সারা রাত মসজিদে থেকে ফজরের সালাতের পর ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন।[১০] আপনি ২০ রমাযান সূর্যাস্তের পর মাসজিদে প্রবেশ করে 'ইবাদত-বন্দেগী করবেন এবং রাত শেষে ফজরের সালাত আদায় করে ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত পর্দাবৃত স্থানে প্রবেশ করবেন। এটি বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আর হাদীসের বর্ণনা তাই বুঝায়।

☞ প্রশ্ন (৯) : ***ঈদুল ফিত্‌র-এর তাকবীর কখন থেকে শুরু করতে হবে এবং কোন সময় পর্যন্ত বলতে হবে? এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানালে খুবই উপকৃত হব।*** *(আ: ওয়াহেদ, নারায়ণগঞ্জ)*

উত্তর : রামাযানের পূর্ণতার পর সূর্যাস্ত হলে কিংবা ২৯ রামাযান অতিক্রমের পর ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই তাকবীর বলা শুরু করতে হবে এবং ঈদের সালাত পর্যন্ত এ তাকবীর চলবে।[১১] আর ঈদের তাকবীর হবে নিম্নরূপ:

"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।"

ভিন্ন শব্দেও তাকবীর বর্ণিত আছে।[১২]

উল্লেখ্য যে, এ তাকবীর প্রত্যেক মুসলিম নিজে নিজে উচ্চঃকণ্ঠে বলবে; সম্মিলিতভাবে বলার কোন প্রমাণ সহীহ সুন্নাতে নেই। পৃথক পৃথক বলার মাধ্যমে সমস্বর হলে কোনো অসুবিধা নেই। ওয়াল্লাহু 'আলামু

---

[৭] সহীহ বুখারী-হা : ১৮০৫, সহীহ মুসলিম হা : ৯৮৪, সুনান আবূ দাউদ হা : ১৬১১, আত্ তিরমিযী- হা : ৬৭৫, সুনান আন্ নাসায়ী হা : ২৫০০ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা : ১৪২৫।

[৮] আবূ দাউদ হা : ১৬০৯, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা : ১৮২৭।

[৯] সহীহ বুখারী হা : ১৫১১ ও সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা : ২৩৯৭।

[১০] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম হা : ১১৭৩, সুনান আবূ দাউদ হা : ২৪৬৪, আত্ তিরমিযী হা : ৭৯১, সুনান আন্ নাসায়ী হা : ৭০৯ ও সুনান ইবনু মাজাহ্ হা : ১৭৭১।

[১১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫।

[১২] সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী, ২/৪৬২।

প্রশ্ন (১০) : *আমাদের এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় ঈদের সালাতে মহিলা জামা'আত ও মহিলা ইমাম দ্বারা খুতবাহ্ ও সালাত পরিচালিত হয়ে আসছে। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এভাবে সালাত আদায়ের যৌক্তিকতা জানতে চাই। (ইমদাদুল হক, যশোর)*

উত্তর : মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে মুসলিমদের জামা'আতে শামিল হয়ে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত।

মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে আলাদা জামা'আত করে সালাত আদায় করার কোন বিধান ইসলামী শারী'আতে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও বাদ দেননি। তারা সালাতে শামিল হবে না; তবে কল্যাণময় এ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করবে এবং মুসলিমদের দু'আয় শরিক হবে।[১৩]

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের জন্য পৃথক জামা'আতের নির্দেশ দেননি, সেহেতু প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থায় মহিলা জামা'আত বৈধ হবে না। وَاللهُ أَعْلَمُ

প্রশ্ন (১১) : *আমি মাঝে মাঝে নফল সিয়াম পালন করি। কখনো অসুবিধায় পড়ে তা ভাঙতে হয়। আমাকে একজন 'আলেম বললেন : সিয়ামের নিয়্যাত করলে না-কি তা ছাড়া নিষেধ! আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। আশাকরি সঠিক উত্তর পাব। (ইসহাক আলী)*

উত্তর : নফল সিয়াম প্রয়োজনে ছেড়ে দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। নফল সিয়াম অতিরিক্ত বিষয় আবশ্যক নয়। তাই সিয়াম পালনকারী নিজে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সিয়াম পূরা করবে কিংবা ছেড়ে দেবে। একদা রাসূল ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– খাবার কিছু আছে কি? তখন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها তাঁর ﷺ জন্য ছাতু পেশ করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন : "আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছি'। অতঃপর (সিয়াম ভেঙে) তাথেকে কিছু খেলেন।[১৪]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নফল সিয়াম পালনকারী তার ইচ্ছানুযায়ী সিয়াম ছাড়তে পারে। অনুরূপ সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه নফল সিয়াম ভাঙাকে কিছুই মনে করতেন না।[১৫]

[১৩] সহীহ বুখারী- হা : ৩২৪ ও সহীহ মুসলিম হা : ৮৯০।
[১৪] সহীহ মুসলিম- হা : ১১৫৪।
[১৫] মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব- হা : ৭৭৬৭।

প্রশ্ন (১২) : *আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করেন। আমার প্রশ্ন-মাসজিদ ছাড়া বাড়িতে ই'তিকাফ করা জায়িয হবে কি? এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কিছুটা বিতর্ক চলছে। দয়া করে দলীলভিত্তিক জবাব দেবেন। (আ: বারী, কুমিল্লা)*

উত্তর : ই'তিকাফ মাসজিদেই করতে হয়। বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ করলে তা সঠিক হবে না; বরং এটিকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বৈরাগ্যতা বলা হবে। মহান আল্লাহ ই'তিকাফকে মাসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬] কেননা, ই'তিকাফের পারিভাষিক অর্থই হচ্ছে- মহান আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য মাসজিদে অবস্থান করা।[১৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মাসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন। এ কারণে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বাড়িতে ই'তিকাফ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৮] কাজেই ক্বিয়াসভিত্তিক ফাতওয়ার আলোকে কারো বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (১৩) : *যাকাতুল ফিত্‌র প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা আছে কী? যদি সময় নির্ধারিত থাকে, তাহলে কখন আদায় করতে হবে, তা জানিয়ে বাধিত করবেন। (আশিক হাওলাদার, রাজশাহী)*

উত্তর : যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার সময় শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। আর তা হচ্ছে- ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে। অর্থাৎ- ফিতরা আদায় করে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করা। ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার আদেশ দেন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে।[১৯] তবে ফিতরা দেয়ার সময় শুরু হয় রমাযানের শেষ দিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে।[২০] ঈদের দু'এক দিন আগেও ফিত্‌রা আদায় করা যেতে পারে। কারণ সাহাবীদের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম) মধ্যে অনেকেই ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করতেন।[২১] উল্লিখিত নিয়মে ফিত্‌রা আদায়

[১৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১২৫ ও ১৮৭।
[১৭] আশ-শারহুল মুমতি'আ- ৬/৪৯৯।
[১৮] বায়হাক্বী- ৪/৩১৬।
[১৯] সহীহ বুখারী হা : ১৫০৯।
[২০] সাউদী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/৩৭৩।
[২১] সহীহ বুখারী হা : ১৫১১।

করার শর'ঈ বিধান বিদ্যমান। তবে ঈদের সালাতের পরে ফিতরা প্রদান করলে তা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সে ফিত্‌রা প্রদানের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে।[২২] কিন্তু তাই বলে ফিত্‌রা আদায় করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। পরে হলেও তা আদায় করবে এবং বিলম্বের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।- ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (১৪) : ***অর্থ আত্মসাতের অভিযোগসহ অন্যান্য গুরুতর অভিযোগে ধৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য কি যাকাত ফিত্‌রার অংশ দেয়া যাবে? (রাফি ওসমান, পাবনা)***

উত্তর : যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় অথবা এমন অভাবি যে, নিজেকে মুক্ত করার মতো অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং সে যদি স্বীয় কৃত অপরাধে লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় অপরাধ করার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার মুক্তির জন্য যাকাতের খাত থেকে অংশ দেয়া যাবে- অন্যথায় দেয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত প্রদানের ৮টি খাতের আলোচনা এসেছে। তার মাঝে একটি খাত হচ্ছে- الغـارمين তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

وَأَمَّا الْغَارِمُوْنَ : فَهُمْ أَقْسَامٌ : فَمِـنْهُمْ مَـنْ تَحَمَّـلَ حَمَالَـةً أَوْ ضَمِنَ دَيْنًا فَلَزِمَهُ فَأَجْحَفَ بِمَالِهِ، أَوْ غَرِمَ فِيْ أَدَاءِ دَيْنِهِ أَوْ فِيْ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَابَ، فَهَؤُلَاءِ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কয়েক প্রকার। এমন ব্যক্তি যে অন্যের রক্তপণ বা মুক্তিপণের দায়িত্ব নিয়েছে অথবা এমন ব্যক্তি যে আপন ঋণ পরিশোধে হাবুডুবু খাচ্ছে অথবা কোন গুনাহের কাজে। অতঃপর সে তাওবাহ্ করেছে, এমন ব্যক্তিদের প্রদান করা যাবে।[২৩]

ইমাম শাওকানী ও ইমাম কুরতুবী বলেছেন–

هُمُ الَّذِيْنَ رَكِبَتْهُمُ الدُّيُوْنُ وَلَا وَفَاءَ عِنْدِهِمْ بِهَا، وَلَا خِـلَافَ فِيْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِيْ سَفَاهَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهَـا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ.

(যাদের ওপর ঋণ চেপে বসেছে অথচ তা পরিশোধ করার মতো সম্পদ তাদের কাছে নেই। এদেরকে যাকাতের মাল হতে প্রদান করা যাবে।) এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যার ওপর রক্তপণের বোঝা চেপেছে তাকে প্রদান করা যাবে না। যাকাত থেকেও নয়, অন্য কোনো খাত থেকেও নয়, তবে যদি তাওবাহ্ করে।[২৪]

মুফাস্‌সিরগণ তাদের তাফসীরের সমর্থনে নিম্নোক্ত সহীহ হাদীস পেশ করেছেন–

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَـارِقٍ الْهِـلَالِيِّ، قَـالَ : تَحَمَّلْـتُ حَمَالَـةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : أَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَـا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

কবীসাহ্ বিন মাখারিক আল হেলাবী বলেন : আমি রক্তপণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে সে ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলাম। তিনি বললেন : অপেক্ষা করো, সাদাকার মাল আসলে সেখান থেকে তোমাকে প্রদানের নির্দেশ দিব।[২৫]

☞ প্রশ্ন (১৫) : ***লাইলাতুল ক্বদর-এ স্পেশাল কোনো ইবাদত আছে কি? আমরা কীভাবে এসব রাত অতিবাহিত করব এবং কী ধরণের ইবাদত করবো? আশা করি সঠিক জবাব দিয়ে ধন্য করবেন। (আব্দুল আযীয, গাইবান্ধা)***

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবা আজমাঈন লাইলাতুল ক্বদর-এর রাতগুলোকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করতেন। হাজার মাসের নেক্বী অর্জনের প্রতিশ্রুতিময় এ রাতে দীর্ঘ কিয়ামুল লাইল, তাসবীহ-তাহ্‌লীল, ইস্তিগফার ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় এ রাতগুলো তাঁরা অতিবাহিত করতেন। অতএব আমরাও যথানিয়মে লাইলাতুল ক্বদর-এর রাতগুলোকে মূল্যায়ন করব। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো-

প্রথমত : লাইলাতুল ক্বদরকে (২৬ রামাযানের দিবাগত রাত) ২৭ রমাযানের রাতে সীমাবদ্ধ না রেখে এ ক্ষেত্রে

[২২] আবূ দাউদ- অধ্যায় যাকাত,অনুচ্ছেদ- ফিতরের যাকাত।
[২৩] তাফসীর ইবনু কাসীর- ২/৪৭৯।
[২৪] ফতহুল কাদীর- ২/৫৪১, তাফসীরে কুরতুবী- ৮/১৬৬।
[২৫] সহীহ মুসলিম- ২/৭২২, হা. ১০৪৪, সুনান আবূ দাউদ- ১/৫১৫, হা. ১৬৪০, সুনান আন্ নাসায়ী- ৫/৮৮, হা : ২৫৭৯, মুসনাদ আহমাদ- ৩/৪৭৭, হা : ১৫৯৫৭, আলবানী : সহীহ তাহ্‌কীকুল মিশকাত- ১/৪১৪, হা. ১৮৩৭-সহ প্রায় আরো ৭টি গ্রন্থে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে (অর্থাৎ- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯-এর রাত) লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো।[২৬] অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ، فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِيْ الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ.

স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল ক্বদর দেখানো হলো। কিন্তু আমার এক স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ায় আমি তা ভুলে গেছি। অতএব, তোমরা তা রামাযানের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো।[২৭] উল্লিখিত হাদীসের আলোকে রমাযানের শেষ দশকের রাতসমূহে **লাইলাতুল ক্বদর** অনুসন্ধান করতে হবে। তবে ধারাবাহিক দশ রাত জাগরণ করা সম্ভব না হলেও, অবশ্যই শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করতে হবে; অন্যথায় হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম এই মহিমান্বিত রাতের প্রত্যাশিত নেকী অর্জন ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত : অনেকে আবার মাসজিদে জমায়েত হয়ে কোনো ওয়ায়েজকে ডেকে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে এ রাত উদযাপন করেন। কখনো আবার মাসজিদে আলোকসজ্জা ও পানাহারেরও আয়োজন করা হয়। এসব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের যুগে ছিল না। অতএব তা সর্বৈব বর্জনীয়। লাইলাতুল ক্বদর বা কদরের রাতে করণীয় হলো– ক্বিয়ামুল লাইল বিনম্রচিত্তে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, তাফসীর, হাদীস ও দীনী 'ইল্‌ম চর্চা করা এবং বেশি বেশি তাসবীহ্-তাহ্লীল, যিক্‌র-আযকার ও ইস্তিগফার করা এবং সর্বোপরি বেশি বেশি এ দু'আ পাঠ করা–

اَللهمّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন কারীমুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী।" **অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি মহানুভব ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[২৮] -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৬) : ই'তিকাফ কী? ই'তিকাফ করার সহীহ নিয়ম জানতে চাই। আশা করি আপনাদের 'আরাফাত' পত্রিকার মাধ্যমে সঠিক নিয়ম জানতে পারবো।

(আব্দুর রহীম, মাদারীপুর)

উত্তর : ই'তিকাফ অর্থ নিজেকে আটকে রাখা। অর্থাৎ ইবাদতের নিয়তে মসজিদে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বা কিছু সময় একান্ত নিয়োজিত করাকে মূলতঃ ইসলামি পরিভাষায় ই'তিকাফ বলে। এ জন্য মুসলিম জীবনে ই'তিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রত্যেক মহল্লায় বা মাসজিদে কমপক্ষে একজনকে হলেও ই'তিকাফে বসতে হবে, শরীয়তে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা ই'তিকাফ করা সুন্নাত। অতএব, তা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।[২৯] ই'তিকাফ-এর জন্য মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে। এটিই ইমাম চতুষ্টয়সহ জমহুর 'আলেম-এর অভিমত। কেননা, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন।" 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ করার ইচ্ছাপোষণ করলে ফজর সালাত আদায় করেই স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।[৩০] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দীসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে শাইখ সালেহ আল উসাইমীন বলেন, "ই'তিকাফ শুরু হবে ২১ তারিখ রাত থেকে।"[৩১] আর রামাযান শেষ হলে অর্থাৎ- ঈদের নতুন চাঁদ উদিত হলেই ই'তিকাফ শেষ হবে।[৩২] তবে যদি কেউ ফজর সালাত পড়ে বের হতে চায়, তাও করতে পারবে, সালাফদের এমনও 'আমল পাওয়া যায়।[৩৩]

[২৬] সহীহ বুখারী হা : ২০২০ ও ২০১৭; সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৯।
[২৭] সহীহ মুসলিম- হা : ২১২/১১৬৬।
[২৮] সহীহুত তিরমিযী হা : ৩৫১৩।
[২৯] সহীহ বুখারী হা : ২০২৫; সহীহ মুসলিম হা : ১১৭১।
[৩০] সহীহ বুখারী হা : ২০৪১ ও সহীহ মুসলিম হা : ১১৭৩।
[৩১] ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১।
[৩২] ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ- ১০/৪১১; ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১।
[৩৩] কিতাবুল মাজমু- ৬/৩২৩।

উল্লেখ্য যে, ঈদের রাতে 'ইবাদত-বন্দেগী করা এবং রাত্রি জাগরণ করার ফযীলত সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়- এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহ হয় জাল, নয়তো দুর্বল যা 'আমলযোগ্য নয়; বরং বিদ'আত।[৩৪] - ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৭) : মহিলাদের ই'তিকাফের জন্যও কি মাসজিদ আবশ্যক; না-কি নিজ গৃহে ই'তিকাফ করবে? আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ বাসা-বাড়িতে ই'তিকাফ করেন। এটা কি শরিয়তসম্মত? (মুস্তাকিম ফয়সাল)

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ ই'তিকাফ করতে চাইলে তাঁদেরকেও মাসজিদের পর্দাবৃত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মাসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।"[৩৫] মহিলারা নিজগৃহে ই'তিকাফ করবে- এ মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমাননির্ভর কথা, যা সুন্নাহ পরিপন্থি; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

"ই'তিকাফ কেবল জামে' মাসজিদে হতে হবে।"[৩৬] জামে' মসজিদ ছাড়াও ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করলে চলবে। তবে জামে' মসজিদ হওয়া উত্তম। কেননা, ই'তিকাকাফকারীকে জুমু'আর সালাতের জন্য আর কোথাও বের হত হবে না। - ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৮) : *ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী কিংবা মাহরাম মহিলারা সাক্ষাত করতে পারবে কি? বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।*

(ফাহিম হোসেন, খুলনা)

উত্তর : অনেকেরই এমন ধারণা যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী সাক্ষাৎ করতে পারবে না। অথচ নাবীপত্নী সাফিয়্যাহ্ رضي الله عنها বলেন :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। রাতের বেলায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলাম। অতঃপর কথা-বার্তা বললাম।"[৩৭] আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফকালে মাসজিদ হতে মাথা বের করে দিতেন আর তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها চিরুনি করে দিতেন।[৩৮] তবে ই'তিকাফরত ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ﴾

"আর মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।"[৩৯] কাজেই প্রয়োজনে পর্দা রক্ষা করে স্বামীর সাথে দেখা করতে ও তার সেবা করতে পারবে। - ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৯) : *আমাদের সমাজে ঈদের সালাতে সালাত শুরুর আগে কেউ দাঁড়িয়ে লোকদের বলেন, সবাই তাকবীর বলেন কিংবা ইমাম সাথে সবাইকে সমস্বরে তাকবীর পাঠের কথা বলেন। বিষয়টি সঠিক আছে কি-না? মানতে চাই।* ***(আবরার হোসেন)***

উত্তর : ঈদের সালাতের তাকবীর পাঠ সুন্নাহ নির্দেশিত 'আমল। তবে এই 'আমলটি সমস্বরে সবাইকে করার নির্দেশনা দেয়া ভুল কাজ। সবাই মিলে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করা সঠিক 'আমল নয়। মুসল্লী সরবে তাকবীর বলবে এটাই সঠিক। সমস্বরে ঈদের তাকবীর বলা নবী ﷺ ও সাহাবাগণ থেকে সাব্যস্ত নয়। আর নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

---

[৩৪] সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা : ৫২০, ২১৫২২ ফাতওয়া, লাজনাহ দায়িমাহ- ফাতওয়া নং- ১১০২৯।

[৩৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭।

[৩৬] সুনান আবূ দাউদ হা : ২৪৭৩।

[৩৭] সহীহ বুখারী হা : ৩২৮১, সহীহ মুসলিম হা : ২৪/২১৭৫।

[৩৮] সহীহ মুসলি হা : ৬/২৯৭।

[৩৯] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭।

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"আমাদের 'আমলে নেই এমন 'আমল যে করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৪০]

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত ঈদের তাকবীর নিজে নিজে পাঠ করবে, সবাই মিলে নয়।

☞ প্রশ্ন (২০) : ***আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলে ইজতেবা করার কথা বলা হয়। আসলে ইজতেবা কী? এটা কিভাবে করতে হয় এবং এর গুরুত্ব কতখানি? জানিয়ে ধন্য করবেন। (সাইদুল ইসলাম, লক্ষীপুর)***

উত্তর : ইজতেবা আল্লাহর ঘর তাওয়াফকারী পুরুষের জন্য একটি বিশেষ 'আমলের নাম। আর তা হলো- ইহরামের কাপড়ের যে টুকরা দেহের উপরাংশ আবৃত করা হয়, তা তাওয়াফকালে ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের ওপরে ফেলে দেয়া। এভাবে করলে ডান কাঁধ খালি থাকবে। এটি করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আল-জা'রানা হতে 'উমরাহ্ করার সময় এরূপ করেছিলেন।[৪১]

☞ প্রশ্ন (২১) : ***আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর রামাযান মাস এসে যায়। আমি নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে সে সময় রামাযানের সিয়াম রাখতে পারিনি। এটি আজ থেকে ১৭ বছর আগের কথা। বর্তমানে আমার মাঝে এ ক্বাযা সিয়াম আদায় করার প্রবল ইচ্ছা জাগছে। এখন কিভাবে আমি এ সিয়াম আদায় করব? আর দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আমার ওপর কোনো কাফ্ফারা আসবে কি? দয়া করে মাস'আলাটি দিয়ে আমার এ চিন্তা দূর করবেন। (এহসানুল হক, সিলেট)***

উত্তর : ক্বাযা সিয়াম পরবর্তী রামাযান মাস আসার আগেই আদায় করতে হয়। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তী শা'বান মাস তথা রামাযানের আগেই বিগত বছরের ক্বাযা সিয়াম আদায় করতেন।[৪২]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এক রামাযানের সিয়াম অন্য রামাযান আসার আগে আদায় করতে হবে; দ্বিতীয় রামাযান অতিক্রম করা যাবে না। অধিকাংশ 'আলেম এরূপ বিলম্ব করাকে জায়িয মনে করেননি। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলার ক্বাযা সিয়াম আদায়ে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। তাই আর বিলম্ব না করে দ্রুত ঐ সিয়ামগুলো আদায় করুন। উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ বিলম্বের জন্য কাফ্ফার লাগবে কি না, তা নিয়ে উলামাদের মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি, বিধায় কাফ্ফারা লাগবে না।[৪৩] এ বিলম্বের জন্য খালিস নিয়্যাতে তাওবাহ্ করতে হবে। আশাকরি দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন।

☞ প্রশ্ন (২২) : ***মাসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। এ ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। আমার জিজ্ঞাসা- মাসজিদে কোনো অন্যায় হলে বাইরের অন্য জায়গার তুলনায় পাপ কি বেশি হবে? আশাকরি সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। (মঈনুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁও)***

উত্তর : মাসজিদের পবিত্রতা রক্ষা এবং এর আদবের ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। কা'বা ঘরে কোন অন্যায় করলে আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"আর যে ব্যক্তি তাতে (কা'বায়) যুল্‌ম তথা শির্ক-এর দিকে ঝুঁকবে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবো।"[৪৪]

মাসজিদে কোন অন্যায় করা হারাম। একদা দু'জন আগন্তুক মাসজিদে নাববীতে উচুঁ আওয়াজে কথা বললে খলীফা 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : তোমরা মেহমান না হলে তোমাদেরকে আমি প্রহার করে ব্যথা দিতাম।[৪৫]

যদিও উপরোক্ত ধমকী ক্বা'বাহ্ ও মাসজিদে নাববীর বেলায় খাসভাবে প্রযোজ্য, তবুও পৃথিবীর সকল মাসজিদ মহান আল্লাহর ঘর হওয়ায় সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করাও অপরিহার্য। এসব পবিত্র স্থানে 'আমল করলে যেমন বেশি সাওয়াব রয়েছে; ঠিক তেমনি কোনো অন্যায় করলেও এর পরিণাম হবে ভায়াবহ। শারী'আতে অপরাধের ভয়াবহতার কথা বলা হলেও

[৪০] সহীহ মুসলিম- হা : ১৭১৮
[৪১] মুসনাদে আহমাদ হা : ২৭৯২, আবূ দাউদ- হা : ১৮৮৪।
[৪২] সহীহ বুখারী- হা : ১৯৫০ ও সহীহ মুসলিম- হা : ১১৪৬।
[৪৩] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৪।
[৪৪] সূরা আল হাজ্জ আয়াত : ২৫।
[৪৫] সহীহ বুখারী হা : ৪৭০।

কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। তাই অপরাধের পরিমাণ ও শাস্তি প্রতিশোধ গ্রহণকারী মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদেরকে সকলপ্রকার অন্যায় থেকে দূরে অবস্থান করতঃ মহান আল্লাহর ঘরগুলোর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা উচিৎ।

☞ প্রশ্ন (২৩) : ***আমরা সাধারণত সফর অবস্থায় ক্বসর করে থাকি। একদা এক সফরে একজন সালাফী 'আলিমকে দেখতে পেলাম-তিনি স্থানীয় ইমামের অনুরোধে সালাতে ইমামতি করলেন এবং ক্বসর না করে পূর্ণ সালাত আদায় করলেন। আমার প্রশ্ন হলো-এভাবে সফর অবস্থায় ক্বসরের বদলে পূর্ণ সালাত আদায় করা যাবে কি? দয়া করে দলীলসহ জবাব দিয়ে ধন্য করবেন।***

উত্তর : সফর অবস্থায় ক্বসর করা মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর অন্যতম। ইসলাম যে সার্বজনীন এবং সহজ দ্বীন, এটাই তার প্রমাণ। সফরের ক্লান্তির মাঝে আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ক্বসর করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ক্বসর করাই উত্তম। তবে কেউ চাইলে পুরো সালাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্বসর করার বিধানের দলীলেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

"আর যখন তোমরা যমীনে চলো, তখন সালাত ক্বসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা কাফিরদের ফিতনার আশংকা করো। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"[৪৬]

নাবী ﷺ-কে ভয়-ভীতি ছাড়া ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ﷺ বলেন : "এটি একটি সাদাক্বাহ্। আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা তোমাদেরকে সাদাক্বাহ্ করেছেন। কাজেই তোমরা তার সাদাক্বাকে গ্রহণ করো।"[৪৭]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন : "আমরা যখন তোমাদের (মুক্বীম) সাথে হই, তখন ৪ রাক'আত পড়ি। আর যখন আমাদের (মুসাফিরদের) দলে ফিরে যাই, তখন ২ রাক'আত পড়ি। এটি আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাত।"[৪৮]

সাহাবা ﷺ-গণ মিনায় সফর অবস্থায় 'উসমান ﷺ-এর পিছনে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।[৪৯]

অনুরূপভাবে 'আয়িশাহ্ ও সা'দ ﷺ হতে সফরে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন মর্মে প্রমাণ রয়েছে।[৫০]

উপরোক্ত দলীলসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, চাইলে কোন মুসাফির মুক্বিমের ন্যায় পুরো সালাত আদায় করতে পারেন। আর যদি মহান আল্লাহর হাদিয়া গ্রহণ করে ক্বসর করেন, তাহলে সেটি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। কাজেই হে প্রশ্নকারী! আপনি যে সালাফী 'আলিমকে সফর অবস্থায় পুরো সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি সম্ভবত কোন প্রয়োজনে উপরোক্ত দলীল জেনেই সাধারণ বৈধ মনে করে সফরেও পুরো সালাত আদায় করেছেন।

☞ প্রশ্ন (২৪) : ***অতি নিকটবর্তী প্রতিবেশি যদি বিদ'আতি হন, তাহলে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি আদান-প্রদান করলে কোনো গোনাহ হবে কি?***

উত্তর : নিকটতম প্রতিবেশী যদি নিজে বিদ'আত বা কুফরী করেন, কিন্তু তিনি আপনাকে সুন্নাহ মোতাবেক চলতে বাধা দেন না, তাহলে এমন প্রতিবেশীকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করাতে কোনো দোষ হবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾

[৪৬] সূরা আন্ নিসা আয়াত : ১০১।
[৪৭] সহীহ মুসলিম হা : ৬৮৬।
[৪৮] সহীহ বুখারী হা : ১০৮২, মুসনাদ আহমাদ হা : ১৮৬২, সহীহ মুসলিম হা : ৬৮৮।
[৪৯] সহীহ বুখারী হা : ১০৮৪ ও সহীহ মুসলিম হা : ৬৯৫।
[৫০] ইবনুল মুনযির- ৪/৩৩৫।

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[৫১] তবে কোনো অবস্থাতে প্রতিবেশির বিদ'আত, কুফরী বা যে কোনো প্রকারের অন্যায়কে কোনভাবে সমর্থন করা যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"আর পাপ ও সীমলঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না..।"[৫২] নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আপনার প্রতিবেশি চাইলে তাকে দেবেন এবং এ সুযোগে তাকে বিদ'আত বর্জনের উপদেশ করবেন। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (২৫) : *নিছক বিনোদন কিংবা সময়ক্ষেপণ করার উদ্দেশ্যে খেলা দেখা জায়েয হবে কি? আশা করি উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন।*

উত্তর : মানুষের জন্য প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর বড় নিয়ামত। তাঁর কাছে এ সময়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। যেসব খেলায় শরঈ শর্ত মেনে শারীরিক উন্নতি হয় এবং সালাতে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, তা খেলা জায়েয। পক্ষান্তরে নিছক বিনোদনের জন্য বা সময় ক্ষেপনের জন্য খেলাধুলা করা জায়েয নয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদেও সন্তানাদী তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করেনা। যারা এমন করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৫৩] শরিয়ত বাধা দেয় না এমন খেলাধুলায় সময় নষ্ট করাকেও ওলামাগণ অপছন্দ করেছেন।[৫৪] কাজেই সময় ক্ষেপনের জন্য অনর্থক খেলতামাশায় মগ্ন হওয়া তাক্বওয়ার পরিপন্থী। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (২৬) : *ইত্তেবা'আ কী? কার ইত্তেবা'আ করবো-কুরআন-হাদীস থেকে জবাব দেবেন।*

(শফিকুল ইসলাম, টাঙ্গাইল)

উত্তর : ইত্তেবা'আ অর্থ অনুসরণ করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন আদেশ-নিষেধ রূপে, তার অনুসরণ করাই হলো 'ইত্তেবা'আ'। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তারই ইত্তেবা'আ করো। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকগণের অনুসরণ করো না।"[৫৫]

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

"বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। (সেই আল্লাহর) যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তার প্রেরিত সেই উম্মী রাসূলের প্রতি-যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও তার যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তার অনুসরণ করো যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।"[৫৬] কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ বহু দলীল বিদ্যমান, যা প্রমাণ করে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে; অন্য করো নয়। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

---

[৫১] সূরা আল-মুমতাহিনা আয়াত : ৮।
[৫২] সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ২।
[৫৩] সূরা আল-মুনাফিকূন আয়াত : ০৯।
[৫৪] ইমাম শাত্বেবী 'আল-মুয়াফাক্বাত' ১/২০৪ ও ২০৫।
[৫৫] সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ০৩।
[৫৬] সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ১৫৮।

প্রশ্ন (২৭) : *ওসীলা কী? কোন ব্যক্তি বিশেষত আলেম-ওলামা বা ওলী-আউলিয়ার ওসিলায় দু'আ করা যাবে কি?* ***(আতিকুর রহমান, ময়মনসিংহ)***

উত্তর : ওসীলা অর্থ মাধ্যম। দু'আর ক্ষেত্রে তিন প্রকার ওসীলা জায়েয। এক- আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর ওসীলায় দু'আ করা। এটি সর্বোত্তম ওসীলা। দুই- নিজ নেক 'আমলের ওসীলায় দু'আ করা। অর্থ্যাৎ এভাবে দু'আ চাওয়া যে, হে আল্লাহ! অমুক 'আমলটি কেবলমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছি। কাজেই এর ওসীলায় আমার দু'আটি কবুল করো! তিন- উপস্থিত কোনো ভালো মানুষের দু'আর ওসীলায় আবেদন করা। যেমন ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বললেন- হে আল্লাহ! যতদিন তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর ওসীলায় বৃষ্টি চেয়েছি। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাই তাঁর চাচা বয়স্ক সাহাবী আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ওসীলায় বৃষ্টি চাচ্ছি। এ বলে তিনি সাহাবী আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দু'আ করার জন্য আহবান করেন।[৫৭] এভাবে জীবিত উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে দু'আ করতে বলাই হলো সৎ মানুষের ওসীলায় বৃষ্টি চাওয়া। পক্ষান্তরে মৃত বা দূরে অবস্থানকারী অনুপস্থিত ব্যক্তির ওসীলায় বৃষ্টি চাওয়া মানে ঐ লোকের বিশেষ ক্ষমতা আছে বলে মনে করা। আর এ বিশ্বাস শিরকি হওয়ায় এরূপ ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয নয়।[৫৮] -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (২৮) : *আমি কিছু টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করেছিলাম। তখন আমাকে কিছু ঋণ করতে হয়েছিল। বর্তমানে আমি ঐ জমি বিক্রি করে আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। এখন কীভাবে তা দান করলে সঠিক হবে?*

উত্তর : জমি বিক্রয় করার পর প্রথমে আপনার পূর্বের ঋণ পরিশোধ করবেন। অতঃপর অবশিষ্ট টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন। সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

"তোমাদের কৃত ওসীয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধ করার পর ..।"[৫৯] কাজেই জমি ক্রয় করার সময় যে ঋণ করেছিলেন, জমি বিক্রি করে প্রথমে তা পরিশোধ করবেন। তারপর যা থাকবে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন।-ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (২৯) : *আমি আমার ভাই দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। আমি চাই সে কষ্টের কথা আমার ভাইকে জানাই, যাতে সে বুঝতে পারে- সে জুলুমকারী। এখন আমি মেয়ে মানুষ। তাই আমার ভাইকে কীভাবে তার অন্যায় জুলুমের কথা বলবো? উল্লেখ্য যে, আমার ভাই আমি তার ঘরে যাই, তা সে পছন্দ করে না।*

উত্তর : আপনার ভাই দ্বারা যে কষ্ট আপনি পেয়েছেন, তা তার কাছে খুলে বলুন। হতে পারে তাতে সে তার ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন হয়ে যাবে এবং আপনার বুকের চাপা ব্যথা দূর হবে। কারো ভুল ধরিয়ে দেয়া দোষের কিছু নয়; বরং এতে কল্যাণ নিহিত আছে। অগত্যা আপনার ভাই নিজের ভুল না বুঝে যদি আপনার প্রতি আরো রাগান্বিত হন, তাতে আপনার কোনো অন্যায় হবে না। উপরন্তু আপনার ভাই আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করায় দায়ী হবেন। আর এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

"ক্ষমতা পেলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির করেন আর তাদের দৃষ্টিশক্তিকে করেন অন্ধ।"[৬০]

لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطِعٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৬১] অতএব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে সু-সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

---

[৫৭] সহীহ বুখারী হা : ৩৭১০।
[৫৮] আল-বানী 'আত-তাওয়াস্সুল'/৫০-৬৮ পৃ.)

[৫৯] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১২।
[৬০] সূরা মুহাম্মাদ আয়াত : ২২-২৩।
[৬১] সহীহ বুখারী হা : ৫৯৮৪।

প্রশ্ন (৩০) : *আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, এশার পর সালাতুল বিত্‌র শেষ করে বসে বসে ২ রাক'আত সালাত আদায় করা হয়। এটিকে হালকা নফল সালাত বলে। কুরআন-সুন্নাহ হতে এর সত্যতা জানতে চাই। (রিয়াদ মাহমুদ, কুরিগ্রাম)*

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ আট রাক'আত ক্বিয়ামুল লাইল পড়ে তিন রাকা'আত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর কখনো বসে দু'রাক'আত নফল পড়তেন। এটি তাঁর ﷺ নিয়মিত আমল ছিল না। ভাষ্যকারদের মতে, বিত্‌র পড়ার পর কেউ চাইলে আরো নফল পড়তে পারে কিংবা নফল সালাত বসে বসে পড়া জায়েয-এ কথা বুঝাবার জন্য রাসূল ﷺ এমনটি করতেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

كان رسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي ركعتينِ بعد الوترِ وهو جالسٌ

"রাসূল ﷺ বিত্‌র পড়ার পর বসে দু'রাকায়াত সালাত পড়তেন।"[৬২] অতএব, এ হাদীস দ্বারা মুহাদ্দিসগণ 'হালকা নফল' নামে দু'রাক'আত পড়তে হবে মর্মে কোনো অভিমত দেননি। কাজেই এটিকে নিয়মিত 'আমল বানানো ঠিক হবে না। -ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

প্রশ্ন (৩১) : *ঘরে বিড়াল পোষা যাবে কি? এ বিষয়ে দলিলভিত্তিক জবাব জানতে চাই।*

উত্তর : ঘরে বিড়াল পোষা দোষের কিছু নয়; বরং জায়েয। তাকে স্বাধীনভাবে চলতে, ফিরতে ও খেতে দিতে হবে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে-

(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات)

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন : "এটি নাপাক নয়। এটিতো তোমাদের চতুর্পাশে ঘুরে বেড়ায়।"[৬৩]

প্রশ্ন (৩২) : *আমরা জানি যে, 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। কিন্তু 'ইল্‌ম প্রকাশের নামে যে জালিয়াতি হচ্ছে, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কতখানি বৈধ? আমি জালিয়াতি বলতে বুঝাচ্ছি-যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করা, কপিরাইটের আইন লঙ্ঘন করে এ বই ঐ বই থেকে সংকলন করে প্রকাশ করা এবং নিজের নাম লেখক হিসেবে বসিয়ে দেয়া ইত্যাদি। দলীল-প্রমাণ দিয়ে জানালে খুবই খুশি হতাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন –আমীন।*

উত্তর : একথা ধ্রুব সত্য 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"আর হক্বকে বাতিলের সাথে মিশিয়ে না। আর জেনে-বুঝে তোমরা সত্য গোপন করো না।"[৬৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইল্‌ম গোপন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

"যে ব্যক্তি কোনো 'ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা জানার পরও গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে জান্নামের লাগামসমূহের একটি পরিয়ে দেয়া হবে।"[৬৫]

'ইল্‌ম গোপন করা যে বড় অপরাধ এটি বুঝার জন্য উপরোক্ত দলীলদ্বয়-ই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে 'ইল্‌ম প্রকাশের নামে জালিয়াতি করা কখনও বৈধ নয়; বরং সম্পূর্ণ হারাম। আর এর মাধ্যমে উপার্জিত সমুদয় অর্থও হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন। এক ধরনের অসাধু ব্যক্তি বর্তমানে এরূপ ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে কপিরাইটের বিধি লঙ্ঘন করে কাটিং-পেস্টিং করে নিজেদের নামে কিতাব ছাপিয়ে বাজার সয়লাব করে দিচ্ছেন। সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় রূপ দিয়ে কিংবা দু'একটি শব্দ পরিবর্তন বা বাক্য আগে-পিছে করে এটিকেই অনুবাদ ও গবেষণা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এটি যে কত বড় জালিয়াতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা এরূপ কাজ করেন, তারা মূলতঃ তিন দিক থেকে গুরুতর পাপী।

---

[৬২] আল-ফাইরুজাবাদী ' সফরুস সা'আদাহ' বর্ননাকারী: আবু উমামাহ আল-বাহেলী হা.৭৭ (বর্ণনাকারী সহীহ)

[৬৩] ইবনে হাজর আল-আসক্বালানী ' আত-তালখীস' ১/১৫ (সহীহ)। খেতে না দিলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। (সহীহ বুখারী হা.৩২২৩ ও সহীহ মুসলিম হা : ১৫০৭।

[৬৪] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৪২।

[৬৫] সুনান আত্ তিরমিযী হা : ২৬৪৯ (সহীহ)।

(এক) এ কাজ সম্পূর্ণ ইখলাস পরিপন্থি। অথচ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি কাজে ইখলাস অবধারিত করে দিয়েছেন।[৬৬]

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ আলাইহি) তার বিশুদ্ধ সংকলন হাদীস গ্রন্থ সহীহুল বুখারী'র সূচনাতে নিয়্যাত বিশুদ্ধ করার হাদীস নিয়ে বুঝিয়েছেন, 'ইল্‌মের বেলায় বিশুদ্ধ নিয়্যাত আবশ্যক। নতুবা মুনাফিক্বদের কাতারে নাম লেখাতে হবে।

(দুই) নিজে অনুবাদ না করে অন্যের অনুবাদ ও গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ ও প্রচার করে চরম মিথ্যাবাদিতার পরিচয় দেয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন :

"যা তাকে দেয়া হয়নি, তা নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে থাকা মিথ্যা পোষাক পরিধানকারীর ন্যায়।"[৬৭]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজর আল-আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন : "এটি হচ্ছে নিজে 'ইল্‌ম গ্রহণ না করে মিথ্যা দাবি করা এবং যা তাকে দেয়া হয়নি, অন্যের বিষয় নিয়ে মিথ্যাচার করা। যেমনটি মিথ্যা সাক্ষিদাতা মিথ্যা বলে নিজের ওপর যুল্‌ম করে এবং যার জন্য সাক্ষী দেয়, তার ওপরও যুল্‌ম করে।"[৬৮]

(তিন) প্রতারণা করা। আর প্রতারণাকারী নিজেকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত বলে দাবি করতে পারে না। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে আমাদেরকে ধোকা দেবে, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।"[৬৯]

এরূপ প্রতারক অন্যের অনুবাদকে নিজের নামে চালিয়ে দেয় এবং সমাজে নিজেকে লেখক, অনুবাদক ও গবেষক ইত্যাদি নাম খ্যাতি নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে মিথ্যা উল্লাস করে। সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়ে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে বড় বড় 'আলেম খেতাব দিচ্ছে। আর প্রতারক লেখকজি আনন্দের ঢেকুর তুলছেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"যারা (নিজেরা) তাদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে তুমি কখনো মনে করো না যে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (মূলতঃ) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৭০]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা পড়ে পরকালের 'আযাবের ভয়াবহতা হতে বেঁচে থাকার বিশুদ্ধ নিয়্যাতে যাবতীয় মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হই। নিজেরা না করে অন্যের লেখা চুরি করে লেখক সাজার মিথ্যা আস্ফালন থেকে বিরত হই! নতুবা দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করুন –আমীন।

প্রশ্ন (৩৩) : ***জানাযা বা মাইয়েতের সালাতে সানা পড়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত কি না? সানা না সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়া –কোন্‌টি আবশ্যক? দেখা যায়– আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোক জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহাহ্ পড়েন না। এ ব্যাপারে সঠিক জবাব জানতে চাই।***

উত্তর : জানাযা বা মাইয়েতের সালাতে সানা পড়ার কোনো দলীল পাওয়া যায় না। প্রথম তাকবীর দেয়ার পর সাধারণ নিয়মে সূরা ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার সালাতের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন।[৭১]

সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযায় সূরা ফাতিহাহ্ পাঠ করে বলেন– মানুষ যেন জেনে নেয় –এটি সুন্নাত।[৭২]

অতএব জানাযায় প্রথম তাকবীর দেয়ার পর যথারীতি সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। সানা পাঠের যেহেতু কোনো প্রমাণ নেই, তাই এটি পাঠ করা শরীয়ত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

প্রশ্ন (৩৪) : ***কোনো কোনো মাসজিদে দেখি ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসেন। আর বেশিরভাগ মাসজিদে দেখি ইমাম সালাম ফিরিয়ে ক্বিবলামুখী বসে থাকেন এবং দ্রুত সম্মিলিত মুনাজাত করে সুন্নাত শুরু করে দেন। আমি জানতে চাই-রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন্‌টি করেছেন?*** ***(ফাহিম শেখ, কুরিগ্রাম)***

---

[৬৬] সূরা আল বাইয়্যিনাহ্ আয়াত : ৫।
[৬৭] সহীহ বুখারী হা : ৪৯২১ ও সহীহ মুসলিম হা : ২১৩০।
[৬৮] ফাতহুল বারী- ৯/৩১৮।
[৬৯] সহীহ মুসলিম হা : ১/৯৯, সুনান ইবনু মাজাহ্ হা : ২২২৫।
[৭০] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৮৮।
[৭১] আন্ নাসায়ী, বায়হাক্বী, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব হা : ৬৪২৮।
[৭২] সহীহ বুখারী হা : ১৩৩৫, আবূ দাউদ হা : ৩১৮২, আত্ তিরমিযী হা : ১০৩২ ও সুনান ইবনু মাজাহ্ হা : ২৪৯৫।

উত্তর : ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডান দিক হয়ে ঘুরে মুসল্লিমুখী হয়ে বসাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত।

সাহাবী সামুরাহ্ ইবনু যুনদুব ﷺ বলেন : "নাবী ﷺ সালাত আদায় করলে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন।"[৭৩]

সাহাবী আল বারা' ﷺ বলেন : "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা তাঁর ﷺ ডান দিকে বসাকে পছন্দ করতাম –যাতে তিনি (সালাম ফিরানোর পর) আমাদের দিকে ঘুরে বসেন।"[৭৪]

প্রশ্ন (৩৫) : উযু করার সময় আমার সন্দেহ- আমি হাত ধুলাম কি না, বা মাথা মাসেহ করলাম কি না? এমন অবস্থা হলে আমি কী করবো? (মেহেরাজ, দিনাজপুর)

উত্তর : উযূর সময় এরূপ সন্দেহ বেশি বেশি হলে এটিকে সূচিবাই বা সন্দেহ বাতিক রোগ বলে। কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিলে আশা করি তা দূর হয়ে যাবে। মনে রাখবেন- এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করা শয়ত্বানের কাজ। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا "নিশ্চয়ই শয়ত্বান তোমাদের দুশমন, তাকে তোমরা শত্রু হিসেবে গণ্য করো!"[৭৫] অতএব, দৃঢ়চিত্ত হোন, সন্দেহ মুক্ত থাকুন। জেনে রাখবেন-এরূপ সন্দেহ আপনার উযূতে কোনো প্রভাব ফেলবে না।-ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (৩৬) : মহিলাদের ই'তিকাফের জন্যও কি মাসজিদ আবশ্যক; না-কি নিজ গৃহে ই'তিকাফ করবে? আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ বাসা-বাড়িতে ই'তিকাফ করেন। এটা কি শরিয়তসম্মত?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ ই'তিকাফ করতে চাইলে তাঁদেরকেও মাসজিদের পর্দাবৃত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মাসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।"[৭৬] মহিলারা নিজগৃহে ই'তিকাফ করবে–এ মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমাননির্ভর কথা, যা সুন্নাহ পরিপন্থি; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ "ই'তিকাফ কেবল জামে মাসজিদে হতে হবে।"[৭৭] জামে মসজিদ ছাড়াও ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করলে চলবে। তবে জামে মসজিদ হওয়া উত্তম। কেননা, ই'তিকাফকারীকে জুমু'আর সালাতের জন্য আর কোথাও বের হতে হবে না। - ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (৩৭) : ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী কিংবা মাহরাম মহিলারা সাক্ষাত করতে পারবে কি? বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন। (মখছুর রহমান, নোয়াখালী)

উত্তর : অনেকেরই এমন ধারণা যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রী সাক্ষাৎ করতে পারবে না। অথচ নাবীপত্নী সাফিয়্যাহ্ ﷺ বলেন :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। রাতের বেলায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলাম। অতঃপর কথা-বার্তা বললাম।"[৭৮] আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফকালে মাসজিদ হতে মাথা বের করে দিতেন আর তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ ﷺ চিরুনি করে দিতেন।[৭৯] তবে ই'তিকাফরত ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ﴾

"আর মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।"[৮০] কজেই প্রয়োজনে পর্দা রক্ষা করে স্বামীর সাথে দেখা করতে ও তার সেবা করতে পারবে।

---

[৭৩] সহীহ বুখারী হা : ৮৪৬ ও সহীহ মুসলিম- হা : ৭১।
[৭৪] সহীহ মুসলিম হা : ৭০৯ ও সুনান আবূ দাউদ- হা : ৬১৫।
[৭৫] সূরা ফাত্বির আয়াত : ৬।
[৭৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত :১৮৭।
[৭৭] সুনান আবূ দাউদ- হা : ২৪৭৩।
[৭৮] সহীহ বুখারী- হা : ৩২৮১, সহীহ মুসলিম- হা : ২৪/২১৭৫।
[৭৯] সহীহ মুসলিম- হা : ৬/২৯৭।
[৮০] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية النطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত মার্চ ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৩.২৬	০৫:০৫	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০২	০৭:১৭
০২.০৩.২৬	০৫:০৫	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০২	০৭:১৮
০৩.০৩.২৬	০৫:০৪	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:১৮
০৪.০৩.২৬	০৫:০৪	১২:১০	০৩:৩৩	০৬:০৩	০৭:১৯
০৫.০৩.২৬	০৫:০৩	১২:১০	০৩:৩৩	০৬:০৩	০৭:১৯
০৬.০৩.২৬	০৫:০১	১২:১০	০৩:৩৩	০৬:০৪	০৭:১৯
০৭.০৩.২৬	০৫:০০	১২:১০	০৩:৩৩	০৬:০৪	০৭:২০
০৮.০৩.২৬	০৪:৫৯	১২:০৯	০৩:৩৩	০৬:০৫	০৭:২০
০৯.০৩.২৬	০৪:৫৮	১২:০৯	০৩:৩৩	০৬:০৫	০৭:২১
১০.০৩.২৬	০৪:৫৭	১২:০৯	০৩:৩৩	০৬:০৬	০৭:২১
১১.০৩.২৬	০৪:৫৬	১২:০৯	০৩:৩৩	০৬:০৬	০৭:২২
১২.০৩.২৬	০৪:৫৫	১২:০৮	০৩:৩৩	০৬:০৭	০৭:২২
১৩.০৩.২৬	০৪:৫৪	১২:০৮	০৩:৩৩	০৬:০৭	০৭:২২
১৪.০৩.২৬	০৪:৫৩	১২:০৮	০৩:৩৩	০৬:০৮	০৭:২৩
১৫.০৩.২৬	০৪:৫২	১২:০৮	০৩:৩৩	০৬:০৮	০৭:২৩

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
১৬.০৩.২৬	০৪:৫১	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:২৪
১৭.০৩.২৬	০৪:৫০	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:২৪
১৮.০৩.২৬	০৪:৪৯	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:২৫
১৯.০৩.২৬	০৪:৪৮	১২:০৬	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:২৫
২০.০৩.২৬	০৪:৪৭	১২:০৬	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:২৬
২১.০৩.২৬	০৪:৪৬	১২:০৬	০৩:৩২	০৬:১০	০৭:২৬
২২.০৩.২৬	০৪:৪৫	১২:০৬	০৩:৩২	০৬:১১	০৭:২৬
২৩.০৩.২৬	০৪:৪৪	১২:০৫	০৩:৩২	০৬:১১	০৭:২৭
২৪.০৩.২৬	০৪:৪৩	১২:০৫	০৩:৩২	০৬:১২	০৭:২৭
২৫.০৩.২৬	০৪:৪১	১২:০৫	০৩:৩১	০৬:১২	০৭:২৮
২৬.০৩.২৬	০৪:৩৯	১২:০৪	০৩:৩১	০৬:১২	০৭:২৮
২৭.০৩.২৬	০৪:৩৮	১২:০৪	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:২৯
২৮.০৩.২৬	০৪:৩৭	১২:০৪	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:২৯
২৯.০৩.২৬	০৪:৩৬	১২:০৩	০৩:৩১	০৬:১৪	০৭:৩০
৩০.০৩.২৬	০৪:৩৫	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৩০
৩১.০৩.২৬	০৪:৩৪	১২:০৩	৩০:৩০	০৬:১৪	০৭:৩১

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা বহু গুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

সূরা আল হাদীদ- ১১

নিশ্চয়ই সাদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে এবং মন্দ মৃত্যু দূর করে।

সুনান তিরমিযী- ৬৬৪

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (IIUSTB) পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।